মানস ভ্রমণ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

॥ স্বরলিপি কলিকাতা-৯ ॥

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬০ সাল
প্রকাশক ঃ ধীরা চৌধুরী, স্বরলিপি
২৩এ, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা - ৯

প্রচ্ছদ ঃ পূর্ণেন্দু পত্রী

ছেপেছেন ঃ প্রভাসচন্দ্র অধিকারী
স্বপ্না প্রেস, ৩৫/২/১এ বিডন স্ট্রীট,
কলকাতা - ৬

কল্যাণ আঢ্য

অরুণ চট্টোপাধ্যায়

মানস সরকার

তুষার ঘোষ

ও

কাবেরী পাঠককে


মানস ভ্রমণ

ানস ভ্রমণ

া, এটা মানস সরোবরের কথা নয়। অতদূর আমি এখনো যাইনি, যাবার ইচ্ছে আছে।

াসামের একটি সংরক্ষিত অরণ্যের নাম মানস। কউ কেউ বলেন মনাস বা মানাস। কিন্তু মানস ামটিই বেশী প্রচলিত এবং পছন্দসই। ভারতে যে ক'টি সংরক্ষিত বন আছে, তার মধ্যে আয়তনে এটিই সবচেয়ে বড় এবং অনতিগম্য। অনেকদিন থেকেই বশ্বস্ত লোকজনের মুখে এর সৌন্দর্যের কথা শুনেছি; পড়েওছি কিছু জায়গায়, প্রখ্যাত লেখক ই পি জি মানসের বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত। বেশ কয়েক াছর ধরে আমি মানস দর্শনের বাসনা মনে মনে ুষে রেখেছি, যদিও জানতাম, একার চেষ্টায় ওখানে াওয়া সহজ নয়।

ুতরাং অসম সাহিত্য সভার বার্ষিক অধিবেশনে াংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে ঠিক রে নিলাম, এই সুযোগে মানস ঘুরে আসতে বে। আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আসামের রাষ্ট্রমন্ত্রী, পরদিন তাঁর দূতের সঙ্গে যোগাযোগ তেই আমার অভিপ্রায়ের কথা জানিয়ে দিলুম। এ বৎসর অসম সাহিত্য সভার অধিবেশন হলো

অভয়াপুর নামে একটি ক্ষুদ্র শহরে। ম্যাপ খুলে
দেখে নিলাম, সেখান থেকে মানস অরণ্য বিরাট
দূর নয়।

অসম সাহিত্য সভার তুল্য কোনো প্রতিষ্ঠান
আমাদের বাংলায় নেই বলে এর কার্যক্রম সম্পর্কে
আমাদের অনেকের সঠিক ধারণা করা সম্ভব হবে
না। আসামের যে-কোনো রাজনৈতিক দলের
চেয়েও এই সভা বেশী শক্তিশালী এবং জনপ্রিয়।
এঁদের বার্ষিক অধিবেশন প্রতি বছরই কোনো এ
শহরে হয় না। বেছে নেওয়া হয় আসামের যে-
কোনো একটি অঞ্চল, সাহিত্যসভাটি ধারণ করে
বিশাল একটি মেলার আকার, আসে দূর দূর থে
গ্রামীণ মানুষ এই এক একটা উৎসবে যোগ দিতে
সভার বক্তৃতা দশ বারো হাজার মানুষ টুঁ শব্দটি
করে শোনে, সব কিছু না বুঝলেও এটুকু অন্তত ব
যায় যে সাহিত্য বলে একটা ব্যাপার আছে,
মাতৃভাষার একটা গৌরব আছে। এই প্রতিষ্ঠা
পক্ষে সরকারী আনুকূল্য প্রায় পুরোপুরি।
মুখ্যমন্ত্রী সব কাজ ফেলে দু'তিন দিনের জন্য চলে
আসেন এবং যে-দিন তাঁর বক্তৃতা থাকে না সেদি
মঞ্চে দু'তিন ঘণ্টা বসে থেকে শোনেন সব কিছু।
অন্যান্য অনেক মন্ত্রী বড় বড় আমলা এবং
রাজনৈতিক নেতারা ঘোরাফেরা করেন সাধারণ

ৎথির মতন, দুপুরে কয়েক হাজার অভ্যাগতর
বসেন পংক্তিভোজনে। আসেন আসামের
ধিকাংশ লেখক, কবি, শিল্পী, গায়ক। যে-শহরে
হিত্য সভা হয়, সেখানকার রাস্তাঘাটের ঝটিতি
তি হয়ে যায়, তৈরী হয় নতুন বাড়ি ঘর।
হিত্যের জন্য আসাম এতটা করে।

রপাশে ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা অভয়াপুর
হরটি প্রায় গ্রামের মতন, অত্যন্ত ঝকঝকে সুন্দর।
ককালে ছিল ছোট একটি রাজ্য বা জমিদারি,
াক্তন রাজাদের বাড়িটিতে এখনো বসতি আছে।
ইখানকার মেয়ে বাসন্তী দেবীকে বিয়ে করেছিলেন
ত্তরঞ্জন দাশ, তাই প্রবীণেরা এখনো দেশবন্ধুকে
ভয়াপুরের জামাই বলে মনে করেন। এই
য়গাটি গোয়ালপাড়া জেলার মধ্যে, এবং
ায়ালপাড়া আর ভুটান রাজ্যের সীমান্তেই মানস
রণ্য।
া ছিল, আমার জন্য থাকবে একটি গাড়ি, সঙ্গে
বেন আরও দু'তিন জন এবং বন বিভাগের একজন
চপদস্থ অতি উৎসাহী ব্যক্তি। কিন্তু সাহিত্য
ার কাজে অনেকে নিযুক্ত, তা ছাড়া হঠাৎ-
ষিত নির্বাচনের জন্যও সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন,
ুরাং বন্দোবস্তে অনেক ফাটল দেখা দেয়।

যাঁদের সঙ্গে যাবার কথা, তাঁদের খুঁজে পাওয় না, গাড়ির জোগাড় হয় না ঠিক মতন, আমার তত্ত্বাবধায়ক প্রচার সচিব শ্রী দাশ খানিকটা বি হয়ে পড়েন। তিনি প্রস্তাব দেন, আমি যদি আবার কখনো আসি, তিনি সব ব্যবস্থা করে দে এবার ঠিক সম্ভব হবে না। কিন্তু আমি যাবো করেছি, যাবোই। অন্তত শেষ পর্যন্ত চেষ্টা দি হবে।

শেষ চেষ্টার জন্য অভয়াপুর থেকে শ্রী দাশের গাড়িতে চলে এলাম বরপেটা রোডে। গাড়ি চালাচ্ছিলেন শ্রী দাশ নিজে, তাঁর মুখে চিন্তার রেখা। একা একা আমায় ছেড়ে দিলে আমার কোনো বিপদ ঘটতে পারে, তিনি ভাবছিলেন। মানসে একা একা কেউ যায় না। মানসে খাবা দাবারের কোনো ব্যবস্থা নেই। ওখানে হিংস্র বিশেষ করে হাতির উপদ্রব খুব। এরকম জায়গ একলা কোনো অতিথিকে কেউ পাঠায় না। জেলার অরণ্য-অফিসার শ্রী লাহানকে পাওয়া গে আর কোনো চিন্তা নেই, তিনি অতি উৎসাহী মা তিনি সঙ্গে যাবেন এবং সব ব্যবস্থা করে দেবেন বরপেটা রোডে শ্রী লাহানের বাড়িতে গিয়েও ত পাওয়া গেল না। তিনি হঠাৎ গৌহাটি চলে গেছেন। শ্রী দাসের মুখ আরও শুষ্ক হলো।

কিন্তু মনে মনে খুশী হয়ে উঠলাম। যত
আর কোনো সঙ্গী পাওয়া যাবে না. তত
উৎসাহ বাড়ছে। আমি একাচোরা ধরনের
একা একা বেড়াতেই ভালোবাসি।
বের সঙ্গে দল বেঁধে অনেক জায়গায় গেছি
কিন্তু কোথাও গিয়ে নতুন কারুর সঙ্গে
। জমিয়ে নেবার ব্যাপারে আমার উৎসাহ
আমি সু-আলাপী নই। তাছাড়া দল বেঁধে
ার এই দেখার স্বাদই আলাদা। মানস
আমি আপন মনেই দেখতে চাই।
চাই শুধু একটা গাড়ি, কেননা, পায়ে হেঁটে
ই একদিনে মানসে পৌঁছানো যায় না,
থেকেই অন্তত পঁয়ত্রিশ মাইল রাস্তা।

দিকে পনেরো-কুড়ি মাইল উজিয়ে আসা
রপেটা শহরে। সেখানে শ্রী দাশের জেলা-
ীর অফিসে যদি সেই সহকারীকে পাওয়া
তিনিও নেই। সেদিন রবিবার কে কোথায়
ক নেই তো। সেই অফিসে আছে একটি
জিপই দরকার, জঙ্গলের পাহাড়ী রাস্তায়
সেডর সুবিধা-জনক নয়। কিন্তু জিপটা
নেই তার ড্রাইভার। ছুটির দিনে সে-ও
। যেন গেছে।

শ্রী দাশ অত্যন্ত ভদ্রতাসম্মত উপায়ে আমাকে
নিরস্ত করার আরও অনেক চেষ্টা করলেন।
আমি অতিথি, তাই রূঢ় কথা বলতে পারেন ন
আমিও ততোধিক ভদ্রতার সঙ্গে আমার গোঁয়া
প্রকাশ করছিলাম।

আসলে, আমাকে মানস-ভ্রমণের প্রতিশ্রুতি দি
তিনি যে সুচারু বন্দোবস্ত করে উঠতে পারছেন
এজন্য তিনি লজ্জিত ও আমার নিরাপত্তা বিষয়ে
চিন্তিত বোধ করছিলেন। আমি তাঁর ঐ লজ্জা
সুযোগ নিচ্ছিলাম পুরোপুরি। আমি সাহিত্য
টভা এড়িয়ে চলি, যদি না তার সঙ্গে আলাদা
ভ্রমণের আনন্দ যুক্ত থাকে। অনেক তেতো
ওষুধের অনুপান যেমন মধু।

শ্রী দাশের গাড়িতে, তাঁর পাশে একটি ষোল-
সতেরো বছরের ছেলে বসেছিল। শ্রী দাশ তা
জিজ্ঞেস করলেন, কি রে, তুই পারবি? ছেলে
নিঃশব্দে ঘাড় নাড়লো। তিনি বললেন, তাহলে
ছাখ, জিপটা চালু অবস্থায় আছে কিনা।

ছেলেটি নেমে যাবার পর শ্রী দাস আমাকে বলে
এই ছেলেটি আমার গাড়ি চালায়। কিন্তু ও
কোনদিন জিপ চালায় নি। ওকে নিয়ে যাওয়া
ঠিক হবে আপনার?

আমি বললাম, কেন, অসুবিধে কী আছে?

উনি বললেন, যেতে যেতেই অন্ধকার হয়ে যাবে, রাস্তা খুব খারাপ, এই ছেলেটা কোনোদিন জিপ চালায়নি, যে-কোনো সময় অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে—

আমি বললাম, কিচ্ছু হবে না, কোনো চিন্তা নেই।

উনি বললেন, সন্ধের পর রাস্তার ওপর হাতি বসে থাকে।

আমি বললাম চমৎকার! তা হলে তো যেতেই হবে।

শ্রী দাশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বিকেল গাঢ় হয়ে এসেছে। পশ্চিম দিকে লম্বা লম্বা ছায়া। এর মধ্যে সেই ছেলেটি জিপ গাড়িটি বার করে এনেছে রাস্তায়। গাড়িটি থেকে মাঝে মধ্যে অদ্ভুত গর্জন রব বেরুচ্ছে—নতুন সওয়ারিকে পিঠে নিয়ে অবাধ্য ঘোড়া যেমন বিরক্তি প্রকাশ করে। জিপটিকে তেল-জল-মোবিল দিয়ে সুস্থির করতে আরও আধঘণ্টা কাটলো, ততক্ষণে পুরোপুরি সন্ধ্যা। চিন্তা ভারাক্রান্ত শ্রী দাশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা এগিয়ে পড়লুম।

ষোলো-সতেরো বছরের অসমীয়া ছেলেটির নাম অতুল ওঝা। সে অত্যন্ত কম কথা বলে। কিংবা জীবনে প্রথম জিপ চালনার দায়িত্ব পেয়ে সে এতই

ব্যস্ত যে কথা বলার সময় নেই। আমার সব প্রশ্নের সে শুধু হ্যাঁ বা না উত্তর দেয়।

যাত্রার আগে কয়েকটি তথ্য আমরা সংগ্রহ করে নিয়েছিলাম। বরপেটা রোডের বাজারে রাত্রির আহার সেরে পরের দিনের খাদ্য সংগ্রহ করে নিতে হবে। কেননা, তারপর মাইল পঁচিশেকের মধ্যে আর কোনো দোকান নেই। চেক পোস্ট থেকে প্রায় মাইল পনেরো দূরে ঘন অরণ্যের মধ্যে ডাক বাংলোতে খাদ্য ব্যবস্থা রাখা সম্ভব হয় না। তবে বাংলোতে আমার নামে একটা ঘর আগে থেকেই রিজার্ভ করা আছে, সে জন্য চৌকিদার আমাকে ফেরাবে না, এবং আমি সঙ্গে চাল ডাল নিয়ে গেলে সে রান্না করে দেবে। মানস অরণ্যে দর্শনার্থী অধিকাংশই সাহেব হয়, তারা সঙ্গে টিনের কৌটোয় খাদ্য ও পাঁউরুটি নিয়ে যায়। ডাকবাংলোয় আলো নেই, আমাদের মোমবাতিও নিতে হবে সঙ্গে করে। বরপেটা রোড বাজারে পৌঁছোবার আগেই নিকষ কালো রাস্তায় জিপ গাড়িটা দু'বার হেঁচকি তুলে থেমে গেল। আমি সচকিতে ওঝাকে জিজ্ঞেস করলাম, কী হলো?

সে কোনো উত্তর না দিয়ে নেমে গিয়ে বনেট খুললো। আমি নিজেও কখনো জিপ চালাই নি, গাড়ির যন্ত্রপাতি বিষয়ে কিছুই বুঝি না। ছেলেটির

পাশে গিয়ে এমনই উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগলুম। ফিনফিনে ধারালো হাওয়ায় বেশ শীত। কলকাতায় এই সময় শীত অনেক কমে গেছে বলে বেশী কিছু গরম বস্ত্র আনিনি। সিগারেট ধরিয়ে ঘন ঘন টান দিতে লাগলুম। এতক্ষণ আমি বেশ মজাই পাচ্ছিলুম সব কিছুতে, কিন্তু রাস্তার মধ্যে গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়াটা একটা বিরক্তিকর ব্যাপার। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার, মাঝে মাঝে দু'একটা ভারী চেহারার গাড়ি যাচ্ছে এদিক ওদিক দিয়ে, আমার ভয় হলো, এই অন্ধকারে কোনো লরি হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে জিপটা আমাদের ঘাড়ের ওপর ফেলে না দেয়। ছেলেটি আমাদের গাড়ির ব্যাকলাইট জ্বেলে রাখে নি। সেটা জ্বেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি হে ওঝা, এ গাড়ি যাবে তো?

সে বললো, হ্যাঁ, যাবে।

আবার কিছুক্ষণ খুটখাট।

এক এক সময় মনে হয়, গাড়িরও বুঝি প্রাণ আছে। অন্তত ইচ্ছা অনিচ্ছা শক্তি আছেই। এই জিপটা বোধহয় তার নিজের ড্রাইভার ছাড়া অন্য কারুর হাতে যেতে চাইছে না। বিশেষত এই রকম একটা বাচ্ছা ছেলের হাতে। নইলে, জিপটার বেশ নতুন নতুন চেহারা, হঠাৎ এরকম পঙ্গু হবার কথা নয়।

ছেলেটিও জেদী কম নয় কিন্তু, লেগে রইলো অনেকক্ষণ, এবং শেষ পর্যন্ত কিছু আওয়াজও বার করে ছাড়লো। এবার সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আমি স্টিয়ারিং-এ বসে সুইচ দিয়ে অ্যাকসিলেটারে পা দিয়ে বসতে পারবো কিনা। এটুকু আমি পারি। সে রকম বসবার পর, কয়েক-বারের চেষ্টায় ইঞ্জিন আবার গর্জন করে উঠলো। তার ফলে, বরপেটা রোড বাজারে পৌঁছোতে আমাদের সাড়ে সাতটা বেজে গেল।

একটা ছোট হোটেলে ঢুকে আমরা দু'জনে খেয়ে নিলাম গরম গরম ভাত আর মাংস। অত্যন্ত সুখাদ্য। যাঁরা পাঁঠার মাংস খেতে ভালোবাসেন, তাঁরা এই সব দূরের ছোট খাটো জায়গায় মাছ ডিম বা মুর্গী না চেয়ে মটন কারিই চাইবেন। কারণ এই সব জায়গায় পাওয়া যায় নরম কচি পাঁঠার ঝোল তার স্বাদই আলাদা। কলকাতার বাজারে ওঠে শুধু ধেড়ে ধেড়ে ছাগল আর রাম ছাগল।

রাত্রির খাওয়া সেরে নিয়ে পরের দিনের জন্য বাজার। চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ সব এক কিলো করে। ডিম পাওয়া গেল না, মাখনও না। ঠিক আছে, একদিন নিরামিষেই চালাতে হবে। এক ডজন মোম কেনার পর একটা টর্চও কিনে ফেললাম। সিগারেট দেশলাইয়ের স্টকও রইলো।

একটা জিনিস নিতে ভুলে গিয়েছিলাম, গাড়িতে ওঠার পরও ওঝাকে আবার পাঠালাম দোকানে। কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা। যা সঙ্গে না থাকলে আমি খাদ্যে কোন স্বাদই পাই না।

এবারেও গাড়ি স্টার্ট নিতে চাইলো না।

অ্যাকসিলেটরে চাপ দিলে খানিকটা ঘ্যাসঘেসে শব্দ করেই থেমে যায়। গাড়িটি সত্যিই বেয়াদপি করছে। লোকালয়ের মধ্যে গাড়ি খারাপ হলেই কিছু কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে। অনেকে অযাচিত ভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাবেন ?

আমি মানস যাবো শুনে কেউ কেউ ভুরু তুললো। মানসে তো কেউ রাত্তিরবেলা যায় না, ঢুকতেই দেয় না ভেতরে।

আমি গম্ভীর ভাবে বললাম, আমার জন্য ব্যবস্থা আছে। আমাকে ঢুকতে দেবে।

তখন দু'একজন বললো, এরপর রাস্তা খুব খারাপ। আর কোনো মানুষজন বা দোকানপাট নেই। গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে খুব বিপদে পড়বেন।

ওরা এমনভাবে কথা বলছে, যেন এখানেই সভ্য জগতের শেষ। এরপর শুধু অরণ্য প্রকৃতির রাজ্য।

খানিকটা পরে অবশ্য আমারও অনেকটা সেরকমই

মনে হলো। লোকজনের সামনে আত্মসম্মান রক্ষা করার জন্য গাড়িটা একটু বাদেই চলতে শুরু করেছিলো। কাছাকাছি একটা রেল লাইন পেরিয়ে যাবার অল্প কিছু পরেই পথ গৃহ-বিরল হয়ে এলো, তারপর দু'পাশে শুধু ধূ ধূ মাঠ। পথের অবস্থা সাংঘাতিক। পথটা এককালে কেউ পাকা করে বানিয়েছিল, তারপর এর কথা একদম ভুলে গেছে। মাঝে মাঝেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গর্ত, ঠিক ঘোড়ার পিঠে সওয়ারের মতন লাফাতে লাফাতে চলেছি।

দু'পাশ খোলা জিপ। হু হু করা ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমার হাত পা আড়ষ্ট করে দিচ্ছে একেবারে। গায়ে শুধু একটা পাতলা সোয়েটার। ব্যাগে এক বোতল ব্র্যাণ্ডি ছিল, সেটা খুলে কয়েকবার কাঁচা চুমুক দিতেই হাত পায়ের সাড়া একটু ফিরে এলো।

জিপ গাড়িটি সত্যিই বড় বেয়াদপ। বেশ বড় কোনো একটা গর্ত লাফাবার পরই হঠাৎ স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়। গীয়ার বদলাবার সময় মড়-মড় মড়াৎ করে বীভৎস শব্দ ওঠে। যেন সে আমাদের নিয়ে যেতে খুবই অনিচ্ছুক। রেলগাড়ির চলার শব্দের যেমন অনেক রকম ভাষা আছে, তেমনি এই জিপ গাড়িটির গর্জনের মধ্যেও ফুটে ওঠে একটা কথা।

'এখনো ফেরো, এখনো ফেরো'। কিন্তু কিশোর ড্রাইভারটি কিছুতেই অবদমিত হয় না। যতবার স্টার্ট থামে, ততবার সে লাফিয়ে নেমে গিয়ে বনেট খুলে কিসের যেন টুং টাং শব্দ করে। সে আগে কখনো জিপ না চালালেই বা, জিপের যন্ত্রপাতি ঘাঁটাঘাঁটি করতে তার কোনো দ্বিধা নেই। প্রতিবারই জিপটা একটু পরে চলতে বাধ্য হয়। সেইজন্য আমার আর ভয় করে না। মনে হয়, হাতে একটা চাবুক থাকলে, ঘোড়ার মতন, এই জিপটাকে বারবার ছপটি মেরে শায়েস্তা করা যেত।

জেনে এসেছি, এর পর আমাদের যেতে হবে একটা চা বাগানের ঠিক মাঝখান দিয়ে। দু'পাশে চা গাছের সারি দেখে বুঝলাম, আর বেশী দেরি নেই, চা বাগানটা পেরুলেই আমরা জঙ্গলের চেক পোস্টে পৌঁছে যাবো। সেখানে যখন এলাম, তখন রাত ঠিক ন'টা।

চেকপোস্টে তালা ঝুলছে, পাশে একটা বড় বোর্ডে এই মর্মে নোটিশ লেখা আছে যে সন্ধ্যে ছ'টার পর আর কারুকে এই অরণ্যে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় না। সেটা দেখায় বিচলিত বোধ করলুম না আমি। ওরকম অনেক লেখা থাকে, সবাই সব কিছু মানে না।

কাছেই ফরেস্ট অফিস, সেখানে ড্রাইভার ছেলেটিকে

পাঠালাম গেট ম্যানকে ডেকে আনবার জন্য। এখানে আরও কয়েকটি বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে, সম্ভবত চা-বাগান সংক্রান্ত লোকেরা থাকে। একজন লোক গান গাইতে গাইতে পায়চারি করছে রাস্তায়। টপ্পা অঙ্গের গান। সম্ভবত শীতের জন্য লোকটির গলায় টপ্পার কাজ বেশী খেলছিল। আমিও গুণগুণ করে একটা গান ধরলাম। 'আমি রূপে তোমায় ভোলাবো না' গানটার 'তোমায়' জায়গাটার কাজ আমার গলায় আসে না, কিন্তু এখন বেশ পেরে গেলাম। আহা, কেউ শুনলো না!

ওঝা ফিরে এলো বেশ খানিকক্ষণ পরে। মুখ শুকনো করে জানালো, গেট কীপার বলছে, এখন গেট খুলবে না।

আমি বিরক্তভাবে বললাম, এখন খুলবে না তো কখন খুলবে?

—সারা রাত খুলবে না, কাল সকালে খুলবে।

—সারারাত তাহলে আমরা এখানে বসে থাকবো নাকি? চলো, আমি যাচ্ছি ওর কাছে।

টপ্পা গায়কটি এবার গান থামিয়ে পাশে এসে বললো, গেট খুললেও তো আপনি যেতে পারবেন না। হাতি মহারাজ আটকে দেবে!

আমি বললাম, হাতি জিপ গাড়িকে কী করবে? পাশ দিয়ে চলে যাবো।

।লোকটি বলল, সরু রাস্তা, হাতির পাল ঐ রাস্তা দিয়ে যেতে ভালবাসে, ঠিক এই সময় রোজ বেরোয় —আপনি গাড়ি ঘোরাতেও পারবেন না। হঠাৎ ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে!

পথের উটকো লোকেদের কথা আমি একদম বিশ্বাস করি না, কিছু লোক সব সময়েই আলটপকা উপদেশ দিতে আসে।

আর কোনো উত্তর না দিয়ে ড্রাইভার ছেলেটির সঙ্গে আমি গেলাম গেটকীপারের ঘরে!

গেট কীপার নিতান্ত হেলাফেলার লোক নয়। প্যাণ্ট সার্ট পরা, দু'একটা ইংরিজি বলে, তার ঘরে একটা রেডিও টেলিফোনের সেট আছে।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সে আমার প্রস্তাব একেবারে উড়িয়েই দিল। বললো, অসম্ভব, এত রাতে আমরা কারুকে যেতে দিই না, আপনি যেতে পারবেনই না। সাতদিন আগে হাতি একটা লোককে মেরে ফেলেছে। ভুটানের ডি এফ ও সাহেব রাত্তিরের দিকে দু দু'বার যেতে গিয়েও ফিরে এসেছেন।

আমি বললাম, আমরা তো আর জঙ্গলের মধ্যে রাত্তিরবেলা ঘুরতে যাচ্ছি না! সোজা গিয়ে বাংলোতে উঠবো। বাংলোতে আজ রাত্তিরের জন্য আমার ঘর রিজার্ভ করা আছে।

লোকটা বললো, এখান থেকে বাংলো একুশ কিলোমিটার দূরে। পুরোটা পথ আপনাকে যেতে হবে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, এর মধ্যে কোনো এক জায়গায় হাতি রাস্তা আটকে দিলেই আর কোন যাবার উপায় নেই। আপনি গাড়ি ঘোরাতেও পারবেন না। মারা পড়বেন। আজ ফিরে যান, কাল সকালে আসবেন!

আমি একটু দমে গেলাম, এত দূর এসে ফিরে যাবো? এখন আবার বরপেটা শহরে ফিরতে হলে ঘণ্টা দু'এক লেগে যাবে। অত রাত্রে সেখানে গিয়েই বা থাকবো কোথায়, কারুকে তো চিনি না সারারাত জিপের মধ্যে কাটাতে হবে, এই শীতের মধ্যে? তার চেয়ে ঝুঁকি নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়াই ভালো। যে-কোনো কারণেই হোক, হাতি সম্পর্কে খুব ভয় জাগছে না মনের মধ্যে। অতবড় একটা জানোয়ারকে দূর থেকে দেখে কোনো ভাবে নিশ্চয়ই পালিয়ে বাঁচা যাবে।

এই সব জায়গায় কয়েকটা বড় বড় নাম উচ্চারণ করলে অনেক সময় কাজ দেয়। আমি গম্ভীর গলায় বললাম, আমি আসামের হোম মিনিস্টারের গেস্ট। চীফ কনজারভেটার অব ফরেস্টের কাছে আমার বন্ধু আমার নামে চিঠি লিখেছেন, আমি আজ অসম সাহিত্য সভায়....

ল হলো একেবারে উল্টো। লোকটি বললো,
াপনি গভর্নমেণ্টের গেস্ট বলেই তো এত চিন্তা
রছি। আপনি যে আসবেন, সেকথা আর টি-তে
ামাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই দেখুন না,
ামার খাতায় আপনার নাম লেখা আছে। কিন্তু
াপনার প্রাণের দায়িত্ব কে নেবে? আপনার
কছু হলে আমাদের কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

ামি বললাম, আপনাদের কাছে পট্‌কা থাকে
া?

াকটি অবাক হয়ে বললো, পট্‌কা? পট্‌কা
চ?

র আগে একবার উত্তরবঙ্গেও জঙ্গলে এই রকম
থজুড়ে হাতি চলাচলের কথা শুনেছিলাম। রাজা-
াত-খাওয়া ছাড়িয়ে জয়ন্তী নদীর ওপরে যে বন,
ার ভেতরের রাস্তার ওপর দিয়ে এক এক সময়
ারাপার করে পঞ্চাশ ষাটটা হাতির পাল।
দিকে, বক্সাইট না ডলোমাইট কি যেন আনবার
ন্য ঐ রাস্তা দিয়ে কিছু ট্রাকও যায়। হাতির
ালের মুখোমুখি পড়ে গেলে ট্রাক থেকে দুম্ দাম
রে পটকা ফাটানো হয়। সেই আওয়াজে হাতির
াল সরে যায়। বুঝলাম, এখানে সে রকম
ানো ব্যবস্থা নেই।

লাম, আমার প্রাণের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। সে

কথা আমি লিখে দিয়ে যেতে রাজি আছি। এতদূর এসে আমি ফিরে যাবো না।

লোকটি দু'এক মিনিট চুপ করে রইলো। তারপর অসন্তুষ্টভাবে বললো, রেঞ্জার সাহেব এখনো ফেরেন নি, তিনি থাকলে দায়িত্ব নিতে পারতেন। আমি একা....তা ছাড়া....

এবার সে ড্রাইভার ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললো, তাছাড়া এইটুকু একটা ছেলেকে নিয়ে আপনি ঐ সাংঘাতিক রাস্তায় যাবেন? এ তো পারবেই না যেতে! এই ছোকরা, তুই যেতে পারবি?

আমি দম বন্ধ করে অতুল ওঝার দিকে তাকিয়ে রইলাম। এই বিপদের সম্ভাবনার কথাটা আমার মনেই পড়েনি। এ যদি রাজী না হয়, তা হলে আমার আর কোনো আশাই নেই!

অতুল ওঝা বীরের মতন উত্তর দিল, হ্যাঁ আমি সাহেবকে ঠিক পৌঁছে দিতে পারবো। আমি ভয় পাই না।

আমি বুক খালি করা একটা নিঃশ্বাস ছাড়লাম। ছেলেটিকে আমার মনে হলো বন্ধুর মতন। সেই সঙ্গে মনে হলো, ভাগ্যিস, কোনো পুরোনো অভিজ্ঞ ড্রাইভারকে পাওয়া যায় নি। অনেকদিন ধরে সরকারী চাকরি করছে, এমন কোনো ড্রাইভার

হয়তো এই অবস্থায় যেতে রাজী হতো না। বহুদিন চাকরি করতে করতে কী রকম যেন একটা ক্ষয়াটে ঘুণধরা মন হয়ে যায়। তখন 'ডিউটি' ছাড়া আর কিছু সম্পর্কেই উৎসাহ থাকে না। নিছক চাকরির খাতিরে কেন একজন ড্রাইভার আমাকে এরকম ঝুঁকির রাস্তায় নিয়ে যাবে এই রাত্তিরে। সে অনায়াসেই বলতে পারতো, না স্যার পারবো না, আমি এখন বাড়ি গিয়ে ঘুমবো! জোর করার কোনো উপায় ছিল না আমার, কারণ আমি অতিথি মাত্র, সরকারী কেউ-কেটা তো নই!

অতুল ওঝার কাঁধে হাত দিয়ে আমি ফিরে এলাম। গেটম্যান অনিচ্ছার সঙ্গে তালা খুলে দিয়ে বললো, আমি আধঘণ্টা অপেক্ষা করবো। খানিকটা গিয়ে বেগতিক দেখলে ফিরে আসবেন। তার পরে এলে কিন্তু আমায় আর পাবেন না। আমার ডিউটি ওভার হয়ে গেছে।

আমি বললাম, ঠিক আছে, জেনে রাখলাম, ধন্যবাদ!

অতুল ওঝা বয়েসে প্রায় কিশোর হলেও বেশ বুদ্ধিমান, তা এই সময় বুঝলাম। সে জিপটার স্টার্ট বন্ধ করে নি। এতক্ষণ ধরে জিপটা ধক্ ধক্ করেছে। এই সময়, গেটম্যানের সামনেই যদি জিপটা স্টার্ট নিতে গোলমাল করতো, তাহলে

অপমানের একশেষ হতে হতো নিশ্চয়ই। তার বদলে, গেট পেরিয়ে সামনের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়লো জিপটা।

গেট পেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যরকম অনুভূতি হয় এখন আমরা জঙ্গলের মধ্যে। যদিও সেখানে তেমন কিছু জঙ্গল নেই। সেটা পূর্ণিমার কাছাকাছি রাত, ফিকে জ্যোৎস্নায় দেখা যায়, চারপাশে প্রায় ফাঁকা মাঠ, এখানে ওখানে দু'একটা গাছ। তবু তো এক ঘোষিত অরণ্যের মধ্যে এসে পড়েছি, এ জায়গাটা বাইরের থেকে আলাদা।

প্রায় দু'কিলোমিটার পথ পার হবার পর জঙ্গল শুরু হয়। তাও এমন কিছু নয়, রাস্তার দু'পাশে বড় বড় ঘাস, এখানে সেখানে ছড়ানো গাছ পালা। দেখলে কোনো ভয়ের অনুভূতি হয় না। রাস্তা বেশ খারাপ, মাঝে মাঝে কাঠের ব্রীজ। ব্রীজগুলোর চেহারা সুবিধাজনক নয়, দু'পাশে দুটো কাঠের পাটাতন, যার ওপর দিয়ে গাড়ি যাবার কথা। অনভ্যস্ত হাতে আমার ড্রাইভার এক একবার সেই পাটাতন থেকে বিচ্যুত হচ্ছে আর শব্দ উঠছে ঘট্ ঘটাং।

আমি অতুল ওঝার কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এ রাস্তায় আগে কখনো এসেছো।

সে বললো, না স্যার।

—এরকম জঙ্গলের রাস্তায় গাড়ি চালিয়েছো কখনো ?

—না, সাব।

—ভয় করছে ?

—না, সাব!

—আমরা ঠিক পৌঁছে যাবো, কি বলো ?

—হ্যাঁ, সাব।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হেড লাইটের আলোয় রাস্তার ওপরেই দুটি চোখ জ্বলজ্বল করে উঠলো। ঠিক সচেতন ভাবে নয়, অচেতন ভাবেই বোধহয় আমি দেখে নিলাম চোখ দুটির উচ্চতা কতখানি। খুব বেশী নয়। এবং কাছাকাছি আরও কয়েকটি চোখ।

আর একটু কাছে আসবার পর দেখা গেল কয়েকটি চিত্রল হরিণ ও একটি বড় সম্বর। হরিণগুলি জীপ গাড়িটার দিকে চেয়ে দেখলো দু'তিন পলক, তারপর এক পলক ফেলার চেয়েও কম সময় তাদের সেই বিখ্যাত ভঙ্গিতে লাফিয়ে উঠে, বায়ুতে সাঁতার কেটে অদৃশ্য হয়ে গেল পাশের অন্ধকারে। সম্বরটি দাঁড়িয়েই আছে, দুটি সরল নির্বোধ চোখ, আমরা যখন খুব কাছে, যখন প্রায় একটা লাঠি বাড়িয়েই তাকে ছোঁয়া যায়, সেই সময় তার ঘোর

ভাঙলো, পেছন ফিরেই উন্মত্তের মতন লাফিয়ে পড়লো একটা ঝোপে, হুড়মুড় করে শব্দ হলো।

এরপর দেখতে পেলাম কয়েকটি ময়ূর। তারা লীলায়িত ভঙ্গিতে রাস্তা পার হচ্ছিল, আলোয় তাদের পালকের বর্ণ সম্ভার চকিতে ঠিকরে ওঠে, তারা প্রত্যেকেই গ্রীবা ঘুরিয়ে একবার তাকায় গাড়ির দিকে। কী অসম্ভব ক্রূর ভয়াল তাদের চোখ! রাত্রিবেলা যে-কোনো জন্তু জানোয়ারের চোখই অন্যরকম হয়ে যায়। সাধারণ কোনো বিড়াল বা গোরুর চোখও অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ আলোয় অচেনা নিষ্ঠুর হয়ে যায়। রাত্রিবেলা মোষের চোখের চেয়ে উজ্জ্বল কোনো জিনিস আমি এ পর্যন্ত দেখিনি। ময়ূরের চোখও অন্যরকম। এদের চোখের মধ্যে থেকে যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে একরকমের বেগুনি ধরনের আলো।

এক ধরনের পাখির চোখেও এরকম আলো দেখলাম। শুধু এই জঙ্গলে নয়। এর আগেও রাত্রির ড্রাইভে বাইরের ফাঁকা রাস্তায় এই ধরনের পাখি চোখে পড়ে। এরা রাস্তায় শুয়ে থাকতে ভালোবাসে। এগুলো কী পাখি? বাদুড় নয়, গায়ের রঙ্ গাঢ় খয়েরি, ডানা মেলে শুয়ে থাকে পিচের রাস্তায়, চোখ দুটি আগুনের ফুলকির মতন, গাড়ি

খুব কাছে এলে এরা ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে যায়।

আরও কয়েকটি হরিণ ও সম্বর পার হয়ে এলাম। হরিণ যতই সুন্দর প্রাণী হোক, রাত্রিবেলা তারা আমাদের মুগ্ধ করে না। রাত্তিরবেলা দলবেঁধে সংরক্ষিত অরণ্যে ঘোরার অভিজ্ঞতা আমার অনেক আছে। প্রত্যেকবারই দেখেছি, কেউ হরিণ পছন্দ করে না। কারণ ঘুরতে ঘুরতে হরিণ বা বুনো শুয়োরই বেশী চোখে পড়ে, বারবার। কেউ কেউ বিরক্তির সঙ্গে বলে ওঠে, 'আঃ হরিণ দেখতে দেখতে চোখ পচে গেল'। কেননা, তখন সকলেরই আগ্রহ আরও কোনও বড় জানোয়ারের জন্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাদের দেখা পাওয়া যায় না। আপাতত আমাদের অধীর অপেক্ষা যেমন হাতির জন্য।

খানিক পরে পাশের ঝোপ থেকে দুটি বেশ বড় প্রাণী বেরিয়ে এসে আমাদের গাড়ির ঠিক সামনের দিকে ছুটতে লাগলো। জিপের চেয়েও তাদের ছোটার গতি বেশী দ্রুত। প্রথমে বেশ চমকে ও ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, মনে হচ্ছিল গণ্ডার। সেই রকমই দেহের আকার। জলদাপাড়া ও কাজিরাঙ্গার মতন মানসেও বেশ কিছু এক-খড়গ গণ্ডারের বাস। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরে ভুল ভাঙলো। গণ্ডার নয়,

মোষের মতন কোনো জানোয়ার, কারণ খড়গ নেই, বিরাট পাকানো শিং। হতে পারে বাইসন, নাও হতে পারে, বন-গোরু হওয়াও বিচিত্র নয়, শুনেছি বন-মোরগের মতন বন-গোরুও আছে এ তল্লাটে। ওদের মাথা দুটি আমরা ভালো করে দেখতে পেলাম না, কিছুক্ষণ আমাদের সামনে রেস দিয়ে ওরা আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

এরপর দশ-পনেরো মিনিট আর কিছু নেই। একটা পাখি পর্যন্ত না। সব দিক নিঃসাড়, নিঃশব্দ।

রাত দশটা বেজে গেছে। রাস্তার সামনের দিকে তাকালে মনে হয় যেন একটা সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে চলেছি। দু'পাশের বড় বড় গাছ ওপরের দিকে গোল হয়ে এসে মিলে গেছে, রাস্তার দুপাশে উঁচু উঁচু ঘাস। এগুলোকেই বোধহয় এলিফ্যাণ্ট গ্রাস বলে।

রাস্তা ফাঁকা দেখে ওঝা বেশ জোরে চালাচ্ছে। ছেলেটির আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই। কিন্তু আমি ওকে একটু সংযত হতে বললাম। হঠাৎ একটা শায়িত হাতির গায়ে ধাক্কা মারা কোনো কাজের কথা নয়। তখন আর কোনো উপায়ই থাকবে না। তাছাড়া রাস্তা এত খারাপ যে দুর্ঘটনায় মরার সম্ভাবনাই বেশী।

শীতের জন্যই কিনা জানি না, হঠাৎ শরীরে একটা

শিহরণ জাগলো, আর কোনো জন্তু-জানোয়ারের
দেখা পাচ্ছি না বলেই যেন মনে হচ্ছে, আমরা
এবারেই সবচেয়ে বিপদের এলাকায় এসেছি।
ভয় ও অস্বস্তি কাটাবার জন্য ব্র্যাণ্ডির বোতল থেকে
আর একটা লম্বা চুমুক দিলাম। চোখ দুটি
যথাসম্ভব খর করে সামনের দিকে স্থির। দূরের
ঝোপসি ঝুপসি গাছপালাকে মনে হচ্ছে হাতির
পাল। যেন, যে-কোন মুহূর্তে আমাদের পথ
আটকে যাবে।
হঠাৎ মনে হলো, আমি যাচ্ছি কেন? এতগুলি
লোক নিষেধ করেছে যখন, তখন নিশ্চিত কিছুটা
প্রাণের ঝুঁকি আছে। পথ জুড়ে যদি হাতির পাল
হয়ে থাকে, তাহলে এখন কী করবো? অর্ধেকের
বেশী রাস্তা পার হয়ে এসেছি। এখন আর ফেরার
উপায় নেই। রাস্তার অবস্থা ক্রমশ আরও
শোচনীয় হচ্ছে, বিরাট বিরাট গর্তে চাকা পড়ে
খবগ করছে স্টিয়ারিং। একবার পাশ দিয়ে
গড়িয়ে গেলেই শেষ। তাহলে এত ঝুঁকি নিয়ে
এলাম কেন? আমি তো কোনো দুঃসাহসী
অভিযাত্রী নই, সাধারণ ভ্রমণকারী মাত্র। রাত্তিরটা
নিরাপদে কাটিয়ে কাল সকালে নিশ্চিন্তে
নির্ভরযোগ্য ড্রাইভার নিয়েই তো আসা যেতে
পারতো। তাতে দিনের আলোয় প্রাণ বাঁচিয়ে

প্রকৃতি দর্শন হতো। কিংবা, কাল সকালেও যদি আসবার অসুবিধে থাকতো, এ যাত্রায় হতো না মানস ভ্রমণ, তাতেই বা কি ক্ষতি এমন? এ জীবনে কত কিছুই তো দেখা হয় নি।

আমার মনের একটা অংশ আর একটা অংশকে খুব জেদীভাবে প্রশ্ন করতে লাগলো, কেন যাচ্ছি? এমনভাবে যাবার কী মানে হয়, উত্তর দাও।

অনেকক্ষণ কোনো উত্তর আসে না। তাতে অস্বস্তি আরও বাড়ে। তারপর মরীয়াভাবে একটা উত্তর পেয়ে যাই। অস্ফুটভাবে বলি, যাচ্ছি, তার কারণ না-যাবারও কোনো মানে হয় না।

এরপর ভেতরটা বেশ হালকা হয়ে যায়।

এভারেস্টের শিখর আরোহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একজন অভিযাত্রীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তুমি বারবার ওখানে যাও কেন? উত্তরে তিনি, সেই বিখ্যাত অভিযাত্রীর নাম মালোরি, সংক্ষেপে জানিয়েছিলেন 'বিকজ ইট ইজ দেয়ার!' আমার উত্তরটাও অনেকটা সেইরকম ভেবে আমি নিজের কাছেই একটু অহংকার দেখাই। এর আগেও তো কত জঙ্গলে গেছি, কতরকম ব্যবস্থা ট্যাবস্থা করে, মানসে নিশ্চয়ই এইরকম ভাবেই আমার যাবার কথা ছিল? তা ছাড়া অনিশ্চয়তা বরাবরই আমার প্রিয়।

মাঝে মাঝে কাঠের সেতু পেরুতে হচ্ছে। সেতুগুলোর অবস্থাও সাংঘাতিক, মনে হয় যে-কোনো মুহূর্তে সবশুদ্ধু ভেঙ্গে পড়বে। এইরকম চতুর্থ সেতুটি পেরিয়ে রাস্তাটি সবেমাত্র বাঁক নিয়েছে, এই সময় সারা জঙ্গল কাঁপিয়ে শব্দ হলো।

উম্ ম্ ম্ আঁ আঁ—। যেন একটা বাজ পড়লো। খুব কাছ থেকে এবং এত অসম্ভব জোরে সেই শব্দ যে মনে হলো তা আমার বুকে প্রবল ধাক্কা মেরে আমার হৃৎস্পন্দন থামিয়ে দিয়েছে। ভয়ে আমি চোখ বুজে ফেললাম।

চিড়িয়াখানায় বাঘের ডাক শুনেছি আগে। কিন্তু নিস্তব্ধ জঙ্গলে তার ভয়াবহ জোর যেন একশো গুণ বেশি। তাছাড়া এমনই আকস্মিক। বাঘের কথা আমি একবারও চিন্তা করিনি তাই কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার ভয়-প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল, মনে হলো যেন আমি মরে গেছি। এবং এত জোরালো শব্দের প্রতিক্রিয়া এই যে তারপর কিছুক্ষণ মনে হয়, পৃথিবীতে আর কোনো শব্দই নেই। সব শব্দ মৃত্যুতে নীরব।

আবার চোখ মেলেই পাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, ওঝার মুখ একেবারে ফ্যাকাসে, স্টিয়ারিং-এর ওপর তার একটুও দখল নেই, জিপটা এঁকে বেঁকে পাশের দিকে গড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত

ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে গেল। আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম স্টিয়ারিং-এর ওপর। ডান পা বাড়িয়ে ওঝার পায়ের ওপর দিয়েই এক লাথি কষালাম ব্রেকে।

গাড়িটা থামতেই দ্বিতীয়বার আকাশ ফাটিয়ে বাঘটা ডাকলো। এবার আরও জোরে। মনে হয় পঁচিশ ত্রিশ গজ দূরেই বাঘটা রয়েছে। বাঁ পাশের জঙ্গলে।

বীর বালকটি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। দ্বিতীয়বার বাঘটা ডাকতেই সে হুড়মুড়িয়ে আমার কোলে মাথা গুঁজলো। আমিও মাথা নীচু করে ফেললাম। কেন তা জানি না। আমরা হাতির জন্য চিন্তিত ছিলাম, বাঘের কথা মনেও স্থান দিই নি, তাই ভয়টা কাটানোর কোন উপায়ই মনে এলো না। সম্পূর্ণ শরীরটা কাঁপছে।

খোলা জীপ, বাঘটা আক্রমণ করলে আমাদের বাঁচার কোনো উপায়ই নেই। অস্ত্র বলতে শুধু আমার হাতের ব্রাণ্ডির বোতল। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করলাম, বাঘটা আসুক, আমাদের খেয়ে নিক।

কিন্তু বাঘটা খোলা জায়গায় এলো না। নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে তীব্র চোখে আমাদের দেখছে। যে-কোনো মুহূর্তে লাফিয়ে

পড়বে।

নির্বোধের মতন আমরা গাড়ি থামিয়ে সেখানে চুপচাপ বসে রইলাম দু-তিন মিনিট, যাতে বাঘটার কোনো রকম অসুবিধেই না হয়। বাঘের গর্জনের মধ্যেই বোধহয় এরকম মৃত্যুচুম্বক থাকে। তারপর অতিকষ্টে সেই ঘোর কাটিয়ে আমাদের বেঁচে থাকার চিন্তা ফিরে এলো। বুঝলাম, থেমে যাবার চেয়ে এগিয়ে যাওয়া সব সময়ই ভালো। চলন্ত গাড়িতে আমরা তবু খানিকক্ষণ বেশী বাঁচবো। যেখানে পিছিয়ে যাবার উপায় নেই, সেখানে সামনে এগোতেই হবে।

আমি ওঝাকে মৃদু গলায় বললাম, চলো।

জিপ গাড়িটাও নিশ্চয়ই বাঘের ডাক শুনে ভয় পেয়েছিল। কারণ এবার সে স্টার্ট দিতে একটুও দেরি করলো না। সেখানে যদি জিপটা আবার গণ্ডগোল করতো, তাহলে এ কাহিনী নিশ্চয়ই অন্যরকম হতো। কিন্তু এবার অ্যাক্সিলেটারে চাপ দিতেই জিপটা ব্যস্ত হয়ে সামনের দিকে দৌড়ালো। ওঝার সঙ্গে আমিও ধরে রাখলাম স্টিয়ারিং। গাড়ি চললো মাঝারী গতিতে।

বাঘটা সামনে এলো না, আর ডাকলোও না।

এবং এক হিসেবে সে আমাদের বাঁচিয়ে দিল। বোধ হয় তার জন্যই আমাদের বিপদ কেটে গেল,

এরপর আর কোনো রকম জন্তু-জানোয়ারই চোখে পড়লো না। যদিও বাঘের পরপর দু বার গর্জন শুনে যে ভয় পেয়েছিলাম, তা কাটতে সময় লাগলো যথেষ্ট। বেশ কিছুক্ষণ মাথাটা দুর্বল হয়ে রইলো।

আরও আধঘণ্টা পর পথের ওপর একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়লো। 'ওয়ে টু আপার বাংলো'। তার পাশে লেখা, অরণ্যের স্তব্ধতা নষ্ট করবেন না। ডানদিকে ঘুরে একটা টিলার ওপরে বাংলোয় পৌঁছে গেলাম। হাত-পায়ের জড়তা ছাড়িয়ে গাড়ি থেকে নেমে একটা বড় নিঃশ্বাস নিলাম। শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেছি দেখে বেশ খুশী ভাব হলো। বেঁচে থাকার অমলিন আনন্দ।

হাঁক-ডাক করে তোলা হলো চৌকিদারকে। সে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। ঘুমের থেকেও বেশী বিস্ময়-ভরা চোখ নিয়ে সে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। এগারোটা বেজে গেছে, এত রাত্রে কেউ কোনোদিন তাকে ডেকে তোলেনি। আমরা বে-আইনী আগন্তুক।

আমি তাকে আশ্বস্ত করলুম যে আমাদের খাবার-দাবারের কিছু দরকার নেই। বাংলোর একটি ঘর আমার নামে রিজার্ভ করা আছে, সেটি খুলে দিলেই চলবে।

চৌকিদার জিজ্ঞেস করলো, আপনারা এ সময়
এলেন কি করে? হাতিতে রাস্তা আটকায়
নি?

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, না, হাতি কিছু করেনি। কিন্তু বঘের কথা কেউ আমাকে বলেনি কেন? বরপেটাতেও বলে নি, চেক-পোস্টেও বলেনি। শুধু হাতির ভয় দেখিয়েছে। যদি জানতাম রাস্তায় বাঘ পড়বে, তাহলে আমি আসতাম না। বাঘের সঙ্গে চালাকি চলে না। কেন কেউ
বলেনি?

চৌকিদার বললো, বাঘ? চার নম্বর ব্রীজটার কাছাকাছি?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

চৌকিদার বললো, এখানে চার-পাঁচটা বাঘ মাঝে মাঝে আসে একসঙ্গে?

একটা নয়। চার-পাঁচটা? কিন্তু সে ব্যাপারে কেউ আমাকে সাবধান করে দেয়নি কেন?

চৌকিদার বললো, ওরা এ পর্যন্ত কোনো মানুষ মারে নি। মানুষ দেখলে সরে যায়। আমিও কয়েকবার দেখেছি।

কোন্ বাঘ মানুষ মারবে আর কোন্ বাঘ মারবে না, গভীর রাত্রে জঙ্গলের মধ্যে সে বিচার করার সাধ্য আমার নেই। ডাক শুনেই বুকের অতি পরিচিত

শব্দটা থামবার উপক্রম হয়েছিল। এবং পিলে পর্যন্ত চমকে যাওয়া কাকে বলে, সেই তখনই বুঝেছিলাম।

বাংলোটি প্রকাণ্ড। দোতলা অন্ততঃ আটখানা ঘর। চৌকিদার আমার ঘরটা খুলে দিল। এরপর তার শুধু আর একটা কাজ বাকি।

আগে থেকেই আমার জানা ছিল যে ভোর পাঁচটায় পোষা হাতির পিঠে চেপে এখানে জঙ্গলে ঘোরার ব্যবস্থা আছে। ঠিক সেই সময় সেই হাতি আনবার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে এখনই।

চৌকিদার বললো, কিন্তু সে তো আগে থেকেই খবর দিয়ে রাখতে হয়। তাছড়ো আপনি একা···

···আপনার একার জন্য হাতি........

আমি বললাম, হ্যাঁ আমার একার জন্যই হাতির ব্যবস্থা করতে হবে। যা খরচ লাগে আমি দেবো।

তারপর তার কাঁধে হাত দিয়ে বললাম, ভাই, আগে থেকে খবর দিয়ে আসতে পারিনি, কিন্তু এসে যখন পড়েছি তোমার অতিথি হয়ে, কষ্ট করে একটা ব্যবস্থা করে দাও।

লোকটি গজগজানি ধরনের নয়। শান্ত মুখেই রাজী হলো। তাকে এখন কিছু দূরে মাহুতের ঝোপড়িতে গিয়ে খবর দিতে হবে।

আমি বললাম, আর একটা কাজ, ভোর পাঁচটায় যদি আমার ঘুম না ভাঙে, একটু ডেকে দিও, আর সেই সঙ্গে যদি এককাপ চা···

সে বললো, সঙ্গে চা-চিনি-দুধ এনেছেন ?

এই রে, আর সবই তো বাজার করে এনেছি, চা কেনার কথা মনেই ছিল না। ভোরবেলা এককাপ চা না পেলে কি করে চলবে ?

চৌকিদার বললো, তার কাছে শুধু চা-পাতা আছে। দুধ-চিনি নেই। আমি বললাম, তাই-ই সই।

শুধু লিকার গরম গরম—

চৌকিদার চলে গেল। ড্রাইভার ওঝাও গেল তার সঙ্গে। তারপর আমি সম্পূর্ণ একা হয়ে গেলাম। এতবড় বাংলোটিতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। বাকি সব ঘর তালাবন্ধ।

এতখানি রাস্তা লম্ফমান জিপে চড়ে এসে বেশ ক্লান্ত লাগছে। জামাকাপড় ছেড়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। চমৎকার নরম বিছানা, নতুন মশারি ও কম্বল। কাল ভোরে উঠতে হবে।

কিন্তু আধঘণ্টা শুয়ে থাকার পরও আমার ঘুম এলো না। এতবড় একটা বাড়িতে আমি একা।

ভাগ্যিস আমার সঙ্গে আর কেউ আসে নি এ যাত্রায়। কত দুর্লভ এই একাকিত্ব। শহরে সব সময় মানুষ, সব সময় কেউ না কেউ, সব সময়ে

আমাকে থাকতে হয় নিজের পরিচয়ে। আমি কারুর বন্ধু, কারুর ভাই, কারুর কাছে দেনাদার, কারুর কাছে কৃপাপ্রার্থী। এখানে এই মুহূর্তে আমি কেউ না। আমি শুধু আমি।

এরকম রাতটা ঘুমিয়ে নষ্ট করবার কোনো মানে হয় না।

কাচের গ্লাসে ব্র্যাণ্ডি ঢেলে সেটা হাতে নিয়ে উঠে এলাম দোতালায়। হঠাৎ যেন আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। অসাধারণ জ্যোৎস্না ফুটে আছে দিগন্ত জুড়ে। সামনের দিকে যতদূর তাকাই শুধু অরণ্য। যেন সত্যিই আমি পৃথিবীর সমস্ত ইঁটে গড়া সভ্যতা ছাড়িয়ে চলে এসেছি, এরপর বাকি পৃথিবী জোড়া অরণ্য রাজ্য। আমার ডান পাশে একটা বিশাল চওড়া নদী। এই নদীরও নাম মানস। কিংবা নদীর নামেই অরণ্য। মানস সরোবর থেকে নেমে এসে এই নদী এখানে পড়েছে সমতলে, তাই সব সময় সমুদ্রের মতন গর্জমান। বাংলোর ওপরতলায় একটি বেশ প্রসস্ত কাঁচের ঘর। সেখান থেকে দেখা যায় নদীর ওপারের স্তব্ধ অন্ধকার বনভূমি। বহুদূর থেকে দুটি পাখি একটানা ডেকে চলেছে, টিউ......টিউ......টিউ। রাতে কোন্ পাখি ডাকে আমি জানি না। এমন মধুর সুরেলা স্বরও তো কখনো শুনিনি। মাঝে মাঝে

বন থেকে আর একটা শব্দ আসছে, এটা ধোপার কাপড় কাচার শব্দের মতন অবিকল। এটা নিশ্চিত কোনো জানোয়ারের ডাক। এত রাতে জঙ্গলের মধ্যে বসে কে আর কাপড় কাচবে। কোন্ জানোয়ার জানি না।

জ্যোৎস্নার মধ্যে আমি নিজেই একটি ছায়ামূর্তি হয়ে সারা বাংলোটি ঘুরে দেখলাম। হাওয়ায় কোনো জানলা একবার খোলে আর বন্ধ হয়। একটা শুকনো পাতা উড়ে এসে বারান্দায় পড়ে হঠাৎ আপন মনে ঘুরে ঘুরে খেলা শুরু করে। আমি তন্ময় হয়ে সেই খেলা দেখি। যেন বহুদিন আগে থেকেই ঠিক করা ছিল যে, একদিন রাত্রি সাড়ে বারোটায় মানস ডাকবাংলোয় একটি শুকনো পাতা এইভাবে উড়ে এসে খেলা দেখাবে এবং আমি তা দেখবো।

ডাক বাংলোটির সামনে ধাপ ধাপ ফুলের বাগান নেমে গেছে নীচের দিকে। ঘোরানো পথ চলে গেছে নদীপ্রান্তে। বাংলো থেকে বেরিয়ে এসে সেই পথ ধরলাম। রাত-চরা পাখি দুটি এখনো ডেকে চলেছে, শোনা যাচ্ছে কাপড় কাচার শব্দ। আমার একটু একটু গা ছমছম করছে। কিন্তু ভয়েরও একটা নেশা আছে। যেমন রাত্রির আছে আলাদা জীবন। সচরাচর তো তার সন্ধান পাই না,

তাই পা টিপে টিপে এগিয়ে চললাম। বাঘের জন্যই বেশি ভয় এবং এই ভয় বহু শতাব্দীর। তবে বাংলোর এত কাছে নিশ্চয়ই বাঘ আসবে না। যদিও বা আসে, একটু আগে চৌকিদারের মুখে শুনলাম, এখানকার বাঘ এ পর্যন্ত মানুষ মারে নি। তাহলে আমাকেই বা প্রথম মারবে কেন? কোনো ব্যাপারই প্রথম হওয়ার যোগ্যতা নেই
আমার।

সম্পূর্ণ অচেনা জায়গা, অচেনা অন্ধকার, অচেনা পথ। একবার ভাবলাম আসবার সময় একটা টর্চ কিনেছিলাম তো! কিন্তু ফিরে গিয়ে সেটা নিয়ে আসার ইচ্ছে হলো না। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে মনে হয় যে চর্চের আলোও শব্দ করে
উঠবে।

কয়েকবার সামান্য হোঁচট খেতে খেতেও সামলে নিয়ে পৌঁছে গেলাম নদীর কিনারে। নদীর জল এমন সাদা যে, মনে হয় জমাট জ্যোৎস্নার ধারা। একটু ঝুঁকে সেই নদীর জলে হাত দিতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে হাত সরিয়ে নিলাম। পাহাড়ী নদী সম্পর্কে আমার যথেষ্ট পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। কোথাও কোথাও স্রোত এতই প্রবল হয় যে, ঝোঁক সামলানো যায় না, টেনে নিয়ে যায়।

বেশ কিছুক্ষণ বসে রইলাম সেখানে। সাধারণ

পাহাড়ী নদীর চেয়ে অনেক বেশি প্রশস্ত এলাকায় মানস নদী। তাও শেষ-শীতকাল। বর্ষায় এর রূপ আরও খুলবে। ওপারের ঘন অন্ধকার অরণ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় মনে হয়, ওদিকের সাদা বালির চড়ায় নড়াচড়া করছে একটি প্রাণী। মানুষ? না, হতে পারে না। বাঘ কিংবা হাতিও নয়, তার চেয়ে ছোট। হতে পারে কোনো কুকুর, শেয়াল বা হরিণ। ভালো করে দেখা যায় না, তবু আমার হরিণী বলে মেনে নিতেই সাধ হলো। আমি নিজের কাছে আবার জোর দিয়ে বললাম, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হরিণী।

হরিণীটি সম্ভবত জলপান করতে এসেছিল, বেশী দেরি করলো না, চট করে আবার আঁধারে মিলিয়ে গেল। তবু সে তার ক্ষণিক উপস্থিতিতে যেন ধন্য করে দিয়ে গেল আমাকে। এই নির্জন প্রদেশে সে আমার সঙ্গিনী ছিল। আমি আকাশের দিকে তাকালাম। এমন জ্যোৎস্না বোধ হয় আমি ইহজীবনে আর কখনো দেখিনি। এই শান্ত নীরবতায় তা যেন উদ্ভাসিত হয়েছে সহস্রগুণ বেশী। এই অরণ্যের মধ্যে চন্দ্রকিরণে ভেসে যাওয়া একা এক নদী, তার পাশে একজন একা মানুষ—এই দৃশ্যটি যেন বহু হাজার বছরের পুরোনো। এবং আমার চতুষ্পার্শের যে রূপ, তার মধ্যে আমি যেন

এক নারী সৌন্দর্যের আভাস পাই। এই জ্যোৎস্নার যে-কোন উপমাই নারী। এই স্তব্ধ গহন বনভূমির উপমাও নারী। আমার কাছে নারী সৌন্দর্যই সব সৌন্দর্যের সার। তাই প্রকৃতির কাছে এসেও আমি বাস্তব কোনো নারীর সান্নিধ্য টের পাই। এই জ্যোৎস্নালোক, তার হাস্য, এই আঁধার অরণ্য, তার রহস্যময়তা।

সত্যিই আমি জন্ম রোমান্টিক, আমি না মরলে আমার এই দোষ শুধরোবে না।

এই অপরূপ রাত্রিকে একটি নারী হিসাবে কল্পনা করে আমি রীতিমতন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি, এত শীতের মধ্যেও আমার শরীরে উত্তাপ জেগে ওঠে। বিছানা থেকে কম্বলটা উঠিয়ে এনেছিলাম, সেটা গা থেকে খুলে ফেলে আমি আমার সম্মুখবর্তী শূন্যতাকে আলিঙ্গন করি এবং প্রগাঢ় চুম্বন দিই। চুম্বনটি বেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়। এমনকি শুয়েও পড়ি বালির ওপরে এবং রীতিমতন প্রণয় খেলা শুরু হয়ে যায়।

এর আগে কখনো প্রকৃতির সঙ্গে এত নিবিড়ভাবে প্রণয় আমার হয়নি। প্রকৃতিকেও এমন বহু ঈপ্সিতা, সম্পূর্ণ নারী হিসেবে আমি পাইনি কখনো। আমি তার শরীরের গন্ধ নিই, বারবার গরম আদর দিই তার ওষ্ঠে, তার শরীরের সঙ্গে

শরীর মেশাই।

আবেশে কখন একটু তন্দ্রা এসেছিল, হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে শরীর কেঁপে উঠলো। ভয়ে কিংবা শীতে। আর যাই হোক, এখানে ঘুমিয়ে থাকা যায় না। ঘড়িতে দেখলাম, দুটো পাঁচ। রাত্রির তৃতীয় প্রহরে বেশি করে শীত নামে। প্যাকেটের শেষ সিগারেটটা ধরিয়ে আমি উঠে পড়লাম। এখনো ঘণ্টা আড়াই বিছানায় শুয়ে আরাম করা যেতে পারে।

ঠিক পৌনে পাঁচটার সময় চৌকিদার চা এনে আমাকে জাগিয়ে তোলে। আমি জড়তা কাটিয়ে তড়াক করে বিছানা থেকে নেমে পড়ি। আলস্য করতে গেলেই আলো ফুটে যাবে। তাড়াতাড়ি মুখটুখ ধুয়ে দৌড়োলাম। এবার টর্চটা সঙ্গে নিতে ভুল হলো না।

ডাক বাংলো থেকে রাস্তাটা নেমে গেছে একটা বাঁধের মতন হয়ে। তারই মাঝামাঝি জায়গায় একটা উঁচু সিমেণ্টের মঞ্চ তৈরি করা। সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার ড্রাইভার ওঝাও চোখ ডলতে ডলতে উঠে এসেছে। সেও জঙ্গল দেখবে।

কাছেই দুটো হাতি বাঁধা, একটি বেশ বড়, আর একটা বাচ্চা। অন্ধকারের মধ্যে সে দুটি জমাট

অন্ধকার হয়ে আছে। তাদের গায়ে টর্চের আলো ফেললে কান লটপট করে। এরই কোনো একটাতে যেতে হবে। কিন্তু মাহুত কোথায় ?

মিনিট দশেক পরে মাহুত এলো তৃতীয় একটি হাতি নিয়ে। এই হাতিটির আকার মাঝারি। মাহুতের চেহারাটি দেখে বেশ পছন্দ হলো। আজকাল অনেক কিছুই ঠিক-ঠাক মেলে না। রাখাল বলতেই যে ছবিটা আমাদের চোখে ভেসে ওঠে, সেরকম রাখাল মাঠে-ঘাটে দেখা যায় না। গয়লানীদের যে-রকম ছবি আঁকা হয় সেরকম গয়লানী বহুদিন দেখিনি। সেদিক থেকে এই হাতিটাকে তো হাতির মতন দেখতে বটেই, মাহুতটিও অবিকল মাহুতের মতন। কুচকুচে কালো এবং ছিপছিপে মেদবর্জিত শরীরের একটি যুবক মাথায় পাগড়ি, কোমরে ছুরি গোঁজা ও হাতে ডাণ্ডস। সে কোনো কথা বললো না, ইশারায় আমাকে হাতির পিঠে চেপে বসার কথা জানালো।

হাতির পিঠে হাওদা নেই। একটা ছুটো তোশক ফেলে তার ওপর মোটা দড়ি বাঁধা। ঘোড়ার পিঠে বসার মতন এখানেও বসতে হবে ছু দিকে পা ঝুলিয়ে। কিন্তু ঘোড়ার ছু দিকে পা ঝোলানো আর হাতির ছু দিকে পা ঝোলালো কি এক কথা

হলো? পা দুটি বিসদৃশ অবস্থায় থাকে এবং একটু পরেই বেশ ব্যথা করে। দড়িটাও শক্ত করে ধরে থাকতে হয়। নইলে যে-কোনো মুহূর্তে টাল খেয়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা।

রাস্তা পেরিয়ে হাতি ঢুকলো বনের মধ্যে। তখন সবে মাত্র অন্ধকার পাতলা হতে শুরু করেছে।

একটু পরেই বুঝলাম, হাতি যেখান দিয়ে চলেছে, সেখানে গাড়ি-টাড়ি তো দূরের কথা, পায়ে হেঁটেও মানুষের পক্ষে যাতায়াত সম্ভব নয়। সম্পূর্ণ দুর্ভেদ্য জঙ্গল, গাছে গাছে কোনো ফাঁক নেই বললেই চলে, তাছাড়া রয়েছে লতাপাতার ঝোপ। কিন্তু হাতির গতির মধ্যে একটা বেপরোয়া ভাব আছে, সে কিছুই মানে না, মাঝারি সাইজের গাছও সে মট মটাং করে ভেঙে ফেলে। আমরা মাথা নীচু করে মাথা বাঁচাই। এই সময় মনে হলো, কাল রাত্রে আসবার সময় পথের দু ধারে এরকম অনেক আধভাঙা গাছ দেখেছি, সেগুলি তবে হাতিরই কীর্তি।

ভোরের প্রথম সিগারেটটা ধরালেই বেশ কিছুক্ষণ কাশি হবার কথা। স্মোকারদের এই এক অভিশাপ। কিন্তু সিগারেট ধরিয়েও আমি জোর করে মুখ চেপে রইলাম। কিছুতেই কোনো শব্দ করা চলবে না। সমস্ত বনে হাতির পায়ে চলার শব্দ ছাড়া আর

একটাই শব্দ হচ্ছে শুধু। একটা বন-মোরগের ডাক। তীক্ষ্ণ স্বরটা ভেসে আসছে একটা ঘন ঝোপ থেকে। আমরা সেইদিকেই এগোচ্ছি। ভোরবেলা প্রথম সূর্যালোকের বার্তা দিকে দিকে ঘোষণা করার দায়িত্ব এই মোরগজাতিকে কে দিয়েছে কে জানে! আর কোনো পাখির ডাক এখনও শোনা যাচ্ছে না। সেই রাত পাখি দুটিও বুঝি এখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঝোপটার কাছে আসতেই ঝটপটিয়ে বেরিয়ে এলো বন মোরগটা, অসম্ভব গাঢ় লাল আর হলুদ তার পাখনার রং, আমাদের দিকে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে সে উড়ে গেল অনেক দূরে। যেন মাঝপথে বিঘ্ন ঘটানো হয়েছে তার সঙ্গীতের। তারপর আর কোনো শব্দ নেই।

হাতিটা মাঝে মাঝে কোনো ছোট টিলার ওপর দিকে উঠছে। কখনো নেমে যাচ্ছে কোনো শুকনো নদীগর্ভে। সেই সময় দুহাতে দড়ি আঁকড়ে ধরে দেহের ভারসাম্য রাখতে হয়। হাত আলগা হলেই ধপাস্। সমতলে চলার সময় এত জোর লাগে না।

পোষা হাতির পিঠে চেপে বনের মধ্যে ঘোরার অভিজ্ঞতা আমার আরো হয়েছে কয়েকবার। তখন সঙ্গে অনেক লোক। দু তিনটে হাতি, এবং কেউ

না কেউ কথাবার্তা বলে ফেলেছে। কিন্তু এবার মাহুতকে নিয়ে আমরা মাত্র তিনজন, এবং আধঘণ্টা হয়ে গেল তবু টু শব্দটি পর্যন্ত করিনি। এই স্তব্ধতাটাও উপভোগ্য।

ক্রমশ কয়েকটি হরিণ ও সম্বর দেখা দিতে লাগলো। চিত্রল হরিণগুলিই বড় সুন্দর, দেখলে আশ্রম মৃগের কথাই মনে হয়। আজ সকালের আলোয় শুধু সম্বর নয়, হরিণগুলিও আমরা খুব কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত পালাচ্ছে না। প্রথমে এর কারণ ভেবে অবাক হয়েছিলাম। হরিণগুলিও কি টুরিস্ট দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে? অপেক্ষা করছে কখন আমি ক্যামেরা বার করবো? তত টুরিস্ট তো এখানে আসে না। একটু পরেই কারণটা সম্যক বুঝলাম। জঙ্গলে হাতির পায়ের আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই, এই আওয়াজ হরিণদের চেনা এবং নিরামিষাশী হাতি সম্পর্কে তাদের কোনো ভয় থাকার কথাও নয়। তারপর হঠাৎ যখন তারা হাতির পিঠে কয়েকটি দু-পেয়ে ভয়াবহ প্রাণীকে দেখছে, তখনই তারা পালাচ্ছে। হরিণের পলায়ন দৃশ্য সত্যি দেখবার মতন। বিস্মিত হয়ে তারা লাফিয়ে উঠছে শূন্যে, তারপর সময়কে সময়হীনতায় এনে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আর সম্বরের পলায়নটা একটা জবরজং ব্যাপার, পেছন

ফিরতেই অনেক সময় লেগে যায়। আহা, বেচারা সম্বরগুলো এই জন্যই এত সহজে শিকৃত হয়।

আর একটু দূর যাবার পর মাঝে মাঝেই একটা শব্দ কানে আসতে লাগলো। এই পরিবেশে অ-মানানসই। অনেকটা যেন রেলের পুরোনো কয়লা-ইঞ্জিনের মতন। ঘ্যাস ঘ্যাস ঘ্যাস ঘ্যাস! যতবার শব্দটা শুনি, ততবার চমকে উঠি। কাছাকাছি কি কোনো রেল লাইন আছে? তা হলে আর এমনকি দুর্ভেদ্য অরণ্য! মাহুতকে সে কথাটা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আবার সেই শব্দ হলো ঠিক মাথার ওপরে। দেখলাম, শকুনের চেয়েও বড় আকারের দুটি পাখি, হলদে আর কালো রঙের, উড়ে যাচ্ছে কাছের গাছ থেকে দূরের গাছে। উড়ন্ত এত বড় কোনো পাখি আমি আগে কখনো দেখিনি। একটু পরেই, আরও কয়েকটিকে দেখেই চিনতে পারলাম। ধনেশ পাখি ওগুলো, এখানে রয়েছে শয়ে শয়ে। সে বড় বিচিত্র দৃশ্য। তাদের ডানায় অবিকল রেল ইঞ্জিনের শব্দ।

নিস্তব্ধ, অতি আগ্রহী, অধীর মন ও চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছি সামনে। মাঝে মাঝে কোনো জীবন্ত প্রাণী দেখলেই মনে হয় কিছু যেন একটা পেলাম।

এক সময় মাহুতকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম,
গণ্ডার নেই? গণ্ডার কোথায়?
মাহুত বললো, আছে সাহেব, বহুৎ। কিন্তু এই
সময় পাহাড়ের ওপব দিকে উঠে যায়। মাঝে মাঝে
দেখা যায়—পবশুদিন আমি দুটো দেখেছি।
আমি তাকে গণ্ডার খোঁজার জন্য তাগিদ দিলাম।
সে হাতিকে চালনা করলো বন-বাদাড় ভেদ করে,
অন্যদিকে। তারপরেও বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি
করে গণ্ডার পাওয়া গেল না। তখন বেশ নিরাশ
হয়ে পড়েছিলাম, যেন সবটাই ব্যর্থ হয়ে গেল,
তারপর নিজেকে এক ধমক দিলাম।
অরণ্যে এসে অনেক সময়ই অরণ্য দেখাই হয় না।
ছেলেমানুষেব মতন শুধু জন্তু-জানোয়ার দেখার
ইচ্ছেই জাগে। আমারও এরকম হয়! গণ্ডার না
দেখলে কী এমন ক্ষতি হবে? গণ্ডার কি কখনো
দেখিনি? শুধু চিড়িয়াখানাতেই নয়, উত্তর বাংলার
জলদাপাড়াতেও আমার অরণ্যচারী গণ্ডার দর্শন হয়ে
গেছে আগে। এখানেও শুধু গণ্ডারের জন্য
ছোটাছুটি করে কী লাভ? গণ্ডারের চিন্তা যেই
মন থেকে মুছে ফেললাম, অমনি সমগ্র অরণ্যটাই
আমার চোখের সামনে জাজ্বল্যমান হয়ে
উঠলো।
ইতিমধ্যে সন্তর্পণে খুব কোমল ও বিনীত সূর্য

উঠেছে। এটা সেই ধরনের দুর্লভ একটি ভোর, যখন প্রথম সূর্যের আলো ঠিকরে লাগে চাঁদের গায়ে। আমার সামনের দিকে সূর্য, ঘাড় ফিরিয়ে একবার চাঁদকেও দেখে নিলাম। মনে হয়, এমন যে দেখলাম, এর জন্য নিশ্চয়ই আমার অনেক সুকৃতি জমা ছিল। থোকা থোকা সাদা ফুল ভোরেব আলোয় হঠাৎ রক্তিম মনে হয়। ওড়িশার সিমলিপাল জঙ্গলে এক জায়গায় দেখেছিলাম শুধু অজস্র হালকা ভায়োলেট রঙের ফুল, আর কোনো রঙের ফুল নেই! এক বন্ধু বলেছিলেন, ভূতলে তামা থাকলে নাকি সেখানকার ফুল ঐরকম বেগুনী হয়ে যায়। মানস অরণ্যে বেগুনী ফুল নেই, শুধু সাদা, আর কিছু কিছু টকটকে লাল। কোনোটারই নাম জানি না।

ফুলের চেয়েও এই জঙ্গলে পাখির সমারোহই বেশি। বন-মোরগরা তাদের কর্তব্য সাঙ্গ করেছে। এখন অসংখ্য জাতের পাখি তাদের আলাদা আলাদা সুরে শুরু করে দিয়েছে উষার বন্দনা। যেন অরণ্যের শিখরে শিখরে একটা গানের জলসা বসে গেছে।

মাঝে মাঝেই ছোট ছোট জলাশয়। সেরকম একটির কাছে পৌঁছোতেই দেখলাম, পিঠটা কালচে আর বুকের কাছটা সাদা রঙের একজাতীয় হাঁস

ঝাঁক বেঁধে দারুণ জোরে এসে জলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েই উঠে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে, চক্রাকারে বাতাস কেটে ঘুরে এসে তারা আবার ঐরকম ভাবে জল ছুঁচ্ছে। এটা কি একটা খেলা? নাকি শীতের জন্য স্নান করতে এসেও ওরা বেশিক্ষণ জলে থাকতে পারছে না? এত ভোরে স্নান না করলেই বা কি দোষ ছিল? অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম সেই হাঁস-গুলির জল সইতে আসার খেলা। আবার অন্য একটি ডোবায় অন্যরকম। সেখানে খয়েরি রঙের একটু আলাদা চেহারার কয়েকশো হাঁস নিশ্চিন্তে জলে ভেসে আছে। এদের শীতবোধ নেই? আমাদের হাতিটি অবলীলাক্রমে সেই ডোবাটিতে নেমে পড়তেই ফরফর করে অসংখ্য প্রজাপতির মতন তারা উড়ে গেল। ভাগ্যিস ডোবাটিতে হাতিটির হাঁটুজল।

ডোবাটি পেরিয়ে খানিকটা যাবার পর খানিকটা প্রশস্ত প্রান্তর। তার একেবারে শেষ সীমায় গোটা ছয়েক মোষের মতন প্রাণী গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে কিছু একটা ঘরোয়া সভা করছে। মাহুতটি উত্তেজিতভাবে বললো, সার বাইসন!

প্রাণীগুলি বেশ দূরে এবং ওদিকটায় ঠিক মতন আলো পড়েনি বলে আমি ভালোমতন দেখতে পাচ্ছি না। বললাম, আর একটু কাছে চলো না।

মাহুতটি রাজী হলো না। আমিও অবশ্য খুব পীড়াপীড়ি করলাম না তাকে। জঙ্গলের নিয়ম সে-ই ভালো বোঝে। কাল রাত্রেও যেমন বুঝতে পারিনি, আজ সকালেও তেমন মোষের তুলনায় বাইসনের আলাদা কি বৈশিষ্ট্য তা ঠিক অনুধাবন করতে পারা গেল না।

হাতির মুখ ফিরিয়ে মাহুত জিজ্ঞেস করলো, এবার ফিরবো ? বেলা হয়ে গেছে আর বিশেষ কিছু দেখা যাবে না।

আমি একটু জোর করলে সে হয়তো আরও ঘুরতে রাজী হতো। কিন্তু আমারই উৎসাহ কমে গেছে। হাতির দু'দিকে পা ছড়িয়ে বসার জন্য একটা পায়ে রীতিমতন আড়ষ্ট ব্যথা। এছাড়া ঘণ্টা দুয়েক ধরে দড়ি আঁকড়ে থাকার জন্য ঘষে গেছে হাতের তালু। হাতিটা যখন হুড়মুড় করে জলাডোবায় নামে কিংবা উঁচুতে ওঠে, তখন যে-কোনো মুহূর্তে পড়ে যাবার ভয় হয়। বললাম, চলো।

ফিরছিলাম অন্যদিক দিয়ে। এক সময় জঙ্গলের মধ্যকার যে পথ দিয়ে আমরা কাল জিপে এসেছি, সেটা পার হতে হলো। এবং তার একটু পরেই পেছন থেকে অতুল ওঝা আমার পিঠে একটা খোঁচা মেরে বললো, সাব। ডাইনে—

ডানদিকে তাকাতেই আমি একটি বিশাল দৃশ্য

খতে পেলাম। একটি অতিকায় দাঁতালো হাতি,
র সাদা দাঁত ঝকঝক করছে রোদে এবং নিউ
য়টার্সের প্রতীক চিহ্নের মতন সে শুঁড়টা উঁচু
র আছে।
টকে দেখে আমাদের বাহন এবং মাহুত দু'জনেই
গ চঞ্চল হয়ে উঠলো। মাহুত ডাণ্ডস কষাতেই
মাদের হাতিটা দ্রুতগতিতে একটা ঝোপের মধ্যে
ক স্থির হয়ে রইলো। সেখানটা রীতিমতন
াকার।
মি অতি চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলাম, কী
লা?
হুত বললো, ঐ হাতিটা একলা ঘোরে, ওটা বড়
মাস, গুণ্ডা—
কলা হাতি যে বিপজ্জনক তা আমার জানা ছিল।
চবাং বেশ খানিকটা রোমাঞ্চিত হয়ে পাতার
ক দিয়ে দেখতে পেলাম তাকে।
গু হাতিটা কিন্তু আমাদের দেখতে পেয়েছিল।
মাদের পলায়নকালে সে মাথা ঘুরিয়ে তার খুদে
খে তাকিয়েছিল কয়েক পলক। কিন্তু সম্ভবত
ব মেজাজ এখন প্রসন্ন। সে খুব মন্থরগতিতে
টতে লাগলো। ঠিক যেন মনে হয়, বড়বাবু
নং ওয়াকে বেরিয়েছেন। চোখের সামনে মাত্র
চশ-ত্রিশ গজ দূরে একটি জলজ্যান্ত দাঁতালো

গুণ্ডা হাতিকে আমি দেখতে পাচ্ছি, এটাকে যেন একটা অবিশ্বাস্য সত্য বলে মনে হয়।

মাহুত দাঁতে দাঁত চেপে বললো, শালা রোডের দিকে যাচ্ছে। এই শালা যখন তখন রোডের ওপ শুয়ে থাকে। তখন মানুষ যেতে পারে না।

তাহলে কাল রাত্তিরে এই হাতি মহারাজের জন্যই সবাই আমাদের ভয় দেখাচ্ছিল? আমি পেছন ফিরে অতুল ওঝার দিকে তাকালাম। সেও আমা দিকে চেয়ে হাসলো।

কিন্তু হাতিটা রাস্তার ওপরেই শুয়ে থাকে কেন? অন্য কোথাও শুতে পারে না?

মাহুত যা বললো, তাতে বোঝা গেল যে অতবড় একটা হাতির শুয়ে থাকার মতন ফাঁকা জায়গা এই জঙ্গলে বেশি নেই। সেই তুলনায় রাস্তাটাই ফাঁকা, সেটাই ওদের বিশ্রামের জায়গা।

গুণ্ডা হাতিটা দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবার পর আমরা ঝোপ থেকে বেরিয়ে ফেরা-পথ ধরলাম। এবং বাংলোয় পৌঁছোবার আগে গণ্ডার না-দেখার ক্ষতিপূরণ হয়ে গেল আরও দুটি হাতির পাল দেখে এক-এক দলে দশ-বারোটা হাতি, বুড়ো বাচ্চা মিলিয়ে। একটি দল একটা জলাশয়ে নেমে গোরু-মোষের মতন স্নান করছে! হাতিরা বেশ কৌতুকপ্রবণ। এ ওর গায়ে জল ছিটিয়ে মেতে

চ্ছ খেলায়। আমরা পাশ দিয়ে চলে গেলাম, ক্ষেপও করলো না।

ংলোয় ফিরে এক কাপ দুধ-চিনিহীন চায়ের র্ডার করলাম চৌকিদারকে। গায়ের ব্যথা ববার জন্য বিছানায় গিয়ে একটু শুয়েছি, অমনি নলাম, নারীর কলকণ্ঠ। সঙ্গে সঙ্গে আবার চলে াম বাইরে। ঝলমলে রঙীন পোশাক পরা য়েকটি ভুটিয়া মেয়ে পিঠে একরাশ বোঝা নিয়ে ংলোর গা-ঘেঁষা রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে নদীর কে। আমার দিকে তারা কৌতূহলের সঙ্গে কালো, হঠাৎ একটু থমকে দাঁড়িয়ে তারপর কস্মিক হাসির ঝিলিক দিয়ে আবার চলে গেল। রপর আরও কিছু নারী-পুরুষ, ঐ একই রকম াশাক।

াল রাত্রে ভেবেছিলাম, চৌকিদার ও আমার াইভারকে বাদ দিলে এই জঙ্গলে আমি সম্পূর্ণ কা। কিন্তু মানুষ কোথা থেকে আসছে, কোথায় াচ্ছে?

ধু চা নয়, কয়েকটা বিস্কুটও জোগাড় করে এনেছে াতুল ওঝা। তার কাছ থেকে কিছু খবর পেলাম। াবং একটু পরে, একজন তরুণ বীট অফিসার এসে ামায় সব কিছু জানালো। এই মানস নদীর পারেই ভুটান রাজ্য। এমনকি নদীর এপারেও

কিছুটা অংশ ভূটানের এলাকায়। ওদিকে কাছাকাছি কোনো শহর বা বাজার নেই। ত ভূটানীরা এদিকে আসে বাজার করতে, অনেক সময় দু'দিন তিনদিনের পথ হেঁটে ওরা বাজার আনে।

আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম, তাহলে এই নদী পার হওয়া যায়? ওপারে আমরাও যেতে পারি কোনো বাধা নেই?

বীট অফিসারটি বললেন, না, না, কোনো বাধা নেই। সবাই যেতে পারে।

তৎক্ষণাৎ আমি ওপারে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লুম।

কাল রাত্রে আমি নদীর কিনারে যেখানে এসেছিলাম, তার পাশ দিয়েই রাস্তা চলে গেছে উজানের দিকে। খানিক দূরে খেয়াঘাট। স্বচ নীলবর্ণ জল। তাকিয়ে থাকলে মাছেদের খেল দেখা যায়। এই জায়গাটি ট্রাউট ফিশিং-এর জ বিখ্যাত, তাই সাহেবদের কাছে আকর্ষণীয়। ছি থাকলে আমিও বসে যেতাম। কিছুদিন আগে নাকি এখান থেকে একজন ত্রিশ কেজি ওজনের একটি মাছ ধরেছে।

মানস নদী বেশ খরস্রোতা বলেই পার হবার কায়দাও আলাদা। সরাসরি এপার-ওপার কর

না। নদী পা দিয়েই ল্যাণ্ড ঠেলে ঠেলে বেশ
কটা উজিয়ে যেতে হয়। তারপর স্রোতের
এসে কোণাকুনি খানিকটা পিছিয়ে এসে
রে ওঠা যায়।
রেও নিবিড় বন। কিছুক্ষণ সেই বীট অফিসার
ানীয় কিছু লোকের সঙ্গে জঙ্গলে ঘুরে
ালাম। এখানে সেই কাপড়-কাচার মতন
টির রহস্যেরও মীমাংসা হলো। দু একবার
রকম শব্দ হতেই আমি বীট অফিসারটির দিকে
কালাম। সে বললো, ও হচ্ছে বার্কিং ডিয়ারের
ক। এই জঙ্গলে খুব আছে। ওরা দিনে-রাত্রে
সময় ডাকে।
ট অফিসারটি আর একটি দুর্লভ জিনিস আমাকে
খাবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করলো। বনে বনে
ায় ঘণ্টাখানেক ঘুরে তা দেখতে পেলাম।
জনখানেক গোল্‌ডেন লাঙ্গুর। এরা এক জাতের
নুমান। মুখ কালো দারুণ লম্বা লেজ আর
ায়ের রং ঝকঝকে সোনালি। খুব উঁচু গাছের
গডালে এরা থাকে, দেখলাম, গায়ে রোদ পড়লেই
ায় চোখ ঝলসানো সোনালী আভা বেরোয় এদের
া থেকে। এই জাতের হনুমান এখন অবলুপ্তির
থে। সব সমেত বারো কি চোদ্দটি হনুমানের
সই দলটির দিকে তাকিয়ে বড় বিষণ্ণ মায়া বোধ

করলাম। ওরা ধ্বংস সামনে নিয়ে বসে আছে।

এই বনেও ধনেশ পাখির সংখ্যা প্রচুর। এক এ সময় চেনা যায় যুগল ধনেশ-ধনেশী লম্বা ডানা আছড়ে নদী পার হয়ে চলে যাচ্ছে। ডাকবাংলে চৌকিদার বলেছিল, কয়েকদিন আগে দিনে-দুপুে সে একটি বাঘকেও নদী সাঁতরে এদিকে আসতে দেখেছে। জন্তু-জানোয়াররা এখনো সীমান্ত মানতে শেখেনি। মানস নদীর দু'দিকের অরণ্যে নামই মানস। তাই অরণ্য ও পশুদের সংরক্ষণের যৌথ দায়িত্ব নিয়েছেন ভারত ও ভূটান সরকার।

বীট অফিসারটি শহরের ছেলে, নতুন চাকরিতে ঢুকেছে, অবিবাহিত, জঙ্গলে সে একলা থাকে। কি করে তার সময় কাটে? কিছু বই আছে তার সঙ্গী, তাছাড়া এরই মধ্যে অরণ্য তার ভালো লেগে গেছে। অরণ্যে সবচেয়ে যা তার ভালো লাগে, সে আমাকে বললো, তা হলো অরণ্যের স্তব্ধতা। 'বুঝলেন, এই যে নদীর স্রোতের শব্দ, এটাও সেই স্তব্ধতারই অঙ্গ।' আমার সন্দেহ হলো, সে কবিতা লেখে।

ভূটানের দিকে কয়েকটি বাড়িঘর আছে। কিছু কিছু কাট-কাটার ব্যাপারও রয়েছে। রয়েছে

ভূটানের রাজার একটি সুদৃশ্য বাড়ি। দু পাঁচ বছরের মধ্যেও তার তালা খোলা হয় না। আর একটি বাংলো রয়েছে এদিকে। এখন কেউ নেই। নদীর এপার-ওপারে ভারত-ভূটানের দুটি বাংলোতেই এখন আমিই একমাত্র অধীশ্বর। বীট অফিসারটি বললো, আমি ইচ্ছে করলে ভূটানের বাংলোতেও এসে থাকতে পারি। সেরকম ব্যবস্থা করা যায়।

কারা আসে এখানে? উত্তর পাওয়া খুব শক্ত নয়, সাহেবরা। ভারতের দিকে যে আটখানি ঘরওয়ালা বিশাল বাংলোটি প্রস্তুত, সেটিও তো সাহেবদের মুখ চেয়েই। আমাদের দেশে পর্যটনের সব কিছুই তো সাহেব-নির্ভর। ভিখারির জাত, সব সময় কোল পেতে বসে আছি, কখন দয়া করে কোনো সাহেব-দেবতা আসবে। এসো সাহেব, বসো সাহেব, যো-হুজুর সাহেব, একটু ফরেন এক্সচেঞ্জের ঝুমঝুমি বাজাও তো সাহেব—এই তো আমাদের পর্যটন উন্নয়নের মন্ত্র।

এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতেই আর একটি আশ্চর্য দৃশ্য চোখে পড়লো। নদীর খুব কাছে একটি খড়ের চালের কুঁড়েঘর। তার কাছেই একটা গাছের গুঁড়িতে একটা তক্তা সাঁটা, সেটাতে

খড়ি দিয়ে ইংরেজিতে লেখা 'বার'। আমি স্তম্ভিতভাবে বললাম, এখানে বার?

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। বার রীতিমত খোলা। কোমরে ভোজালি গুঁজে ভূটানের জাতীয় পোশাকে দাঁড়িয়ে আছে বার-টেণ্ডার। অপরূপ সারল্যে উদ্ভাসিত তার মুখ।

বীট অফিসারটি একটু অপ্রসন্নভাবে বললো, চলুন, এখানে দেখবার কিছু নেই, এদিকে পাহাড়ের কাছে অনেক পাখি আছে।

বুঝলাম সে একটু নীতিবাতিকগ্রস্ত। আমি হেসে বললাম, 'একজন যখন এমন নির্জন জায়গায় বার খুলে রেখেছে, তখন কারুকে তো সেটা প্রেট্রোনাইজ করতেই হবে।'

সে বুঝলো না, বললো, চলুন, চলুন।

তখন আমি তাকে বিদায় জানালাম। সে প্রকৃতি দর্শনে গেল, আমি রয়ে গেলাম সেখানেই।

কিন্তু আমার বিস্ময়ের আরও বাকি ছিল। সেই খড়ের ঘরের বারে পর পর সাজানো রয়েছে শুধু স্কচ হুইস্কির বোতল। এখানে স্কচ হুইস্কি? বীট অফিসার ও আমি ছাড়া আর একটিও প্যাণ্ট-শার্ট পরা লোক নেই সেখানে। দাম জিজ্ঞেস করলাম। কলকাতার তুলনায় খুবই সস্তা

হলেও এমন সস্তা নয় যে জঙ্গলের মানুষ কিনতে পারবে। তাদের আয়ত্তের যথেষ্ট বাইরে। তবে, কে খায় এসব ?

উত্তর সেই একই। আমাদের মতন দুর্বল দোনা-মোনা নীতি নেই ভুটান সরকারের। তাঁদের টুরিস্ট বাংলো থাকলেই সঙ্গে বার থাকবে। এই সুদূর জঙ্গলে, যেখানে হয়তো বছরে একবার দুবার সাহেবরা আসে, তাদের জন্য। এবং মানুষ থাক না থাক বার-টেণ্ডার ঠিক তার দোকান খুলে রাখে। পাহাড়ী মানুষরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে চলে যায়।

জানি বাঙ্গালী লেখকদের শুধু লেবুর জল খাওয়াই নিয়ম। কোনো সাহেবসুবোর পার্টিতে লেখকের নিজের উপস্থিতি বর্ণনা দিতে গেলে অনিবার্যভাবে এই লাইনটি এসে পড়ে, 'না, আমার চলে না।' শরৎচন্দ্র মদ খাওয়ার কমপিটিশান দিতে গিয়ে এক সাহেবকে মেরে ফেলেছিলেন, কিন্তু নিজের লেখার মধ্যে কোথাও সেকথা স্বীকার করেন নি।

আমি ওসব বুঝি না। এইরকম পরিবেশে আমি কোনোদিন কোনো স্কচ হুইস্কির দোকান দেখিনি। এখানে স্বাদ নিশ্চয়ই আলাদা হবে। সেদিকে এগিয়ে গেলাম।

কয়েকটি জ্যান্ত গাছকে মাঝখান থেকে কেটে ফেলা

হয়েছে, গুঁড়িগুলোই এখন বসবার জায়গা। চমৎকার ব্যবস্থা। একপাত্র 'কালো-সাদা'র অর্ডার দিলাম। সুশ্রী বারম্যানটি আমার দিকে পানীয় সমেত গেলাস এগিয়ে দিতে, আমি বললাম থোড়া পানি হোগা ? সে তরতর করে ছুটে গিয়ে নদী থেকে এক বোতল জল নিয়ে এলো। সেই পবিত্র মানস সরোবরের জল মিশিয়ে স্কচ পান করতে করতে আমি মুচকি মুচকি হাসতে লাগলাম। আমি এইসব মজা একা একা বেশ উপভোগ করি।

মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল একঝাঁক টিয়াপাখি। নদীর ধারে রাস্তা দিয়ে উঠে এলো সাত-আটটি ভুটানী যুবতী। তাদের পোষাকে সবুজ ও লাল রঙের প্রাধান্য। তাদের দিকে তাকালে তারা চোখ সরায় না, হঠাৎ হঠাৎ হেসে ওঠে। টিয়াপাখির ঠোঁটের রঙের সঙ্গে তাদের ঠোঁটের মিল আছে। একটু পরেই তারা জঙ্গলের মধ্যে মিশে যায়। আবার আর একটি দল জল থেকে উঠে আসে। একটু দূরে পাহাড়ের গায়ে ঘন জঙ্গলের মধ্য থেকে একটি বার্কিং ডিয়ার অনাবশ্যকভাবে ডেকে ওঠে দু'বার। দুটি সারস ধরনের পাখি মানসের ঠিক মাঝখানে জলের কাছেই গোল হয়ে ঘুরছে, ঢেউয়ে ভেঙে যাচ্ছে তাদের ছায়া।

মাথার টুপিতে লম্বা একটা ধনেশ পাখির পালক গোঁজা এক বুড়ো আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। তার মুখে সহস্র ভাঁজ। সে আমাকে বললো, সেলাম সাব! আমিও বললাম, সেলাম। সে আবার বললো, সেলাম। আমিও। সে-ও আবার। এই খেলাটা আমি জানি। গহন অরণ্য হোক বা ধূ-ধূ করা মরুভূমি হোক, যেখানেই পানশালা আছে, সেখানেই এরকম একটি চরিত্র থাকবেই। বৃদ্ধটি আমার গেলাসের দিকে সতৃষ্ণভাবে তাকিয়ে।

'আমি বললাম, ওরে বাবা, বড্ড দামী জিনিস। তোমায় বেশী খাওয়াতে পারবো না। আচ্ছা দাও ওকে এক পেগ।

সে তৎক্ষণাৎ আমার পাশের কাটা-গাছের গুঁড়িতে বসে পড়ে বললো, সাহেব, শের দেখবে? আমি তোমাকে শের দেখাতে পারি। আর রাইনো, সাব, এক এক শিং রাইনো, পাইথন, ইতনা মোটা—

বুঝলাম, অ্যামেরিকান টুরিস্টদের সে এইভাবে ভোলায়। আমি বললাম, আমার কিছু দরকার নেই। কিন্তু তোমাকে বেশী খাওয়াতে পারবো না।

তিন পাত্তর খেয়েই আমি উঠে পড়লাম। লোকটি

বড় বেশী কথা বলছিল। কিন্তু মানুষের কণ্ঠস্বর আমার পছন্দ হচ্ছিল না তখন।

নদীর ধার দিয়ে একা একা হাঁটতে লাগলাম ওপরের দিকে। নানা আকারের পাথর ছড়ানো। ভাবতে ভালো লাগে যে, এইসব পাথর এসেছে শ শ মাইল দূরের মানস সরোবর থেকে। কয়েকটি পাথর কুড়িয়ে নিই, রং ও আকৃতি দেখে সংগ্রহ করতে করতে দু'হাত ভরে যায়। এসব কিছুই জমানো যায় না, তাই আবার একটি একটি করে ছুঁড়ে দিই জলের মধ্যে। একটা পাথরও নদীর এপার থেকে ওপারে পৌঁছে দিতে পারি না।

এক জায়গায় পাতলা জঙ্গল দেখে বসে পড়লাম। বেশ চড়া হয়ে রোদ উঠলেও এখানে গাছের ছায়া। পরিষ্কার বালি। আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ি। দু'পাশে গম্ভীর পাহাড় আমাকে দেখছে। জঙ্গল থেকে যে-কোনো সময় যে-কোনো একটি জন্তুর বেরিয়ে আসা বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু ভয় আসে না। শুয়ে শুয়ে দেখি পাখিদের ওড়াউড়ি। কী অদ্ভুত তীব্র নীল এখানকার আকাশ। মানস সরোবর কী রকম, এই আকাশের মতন? একদিন যেতে হবে।

হাত থেকে খসে পড়ে সিগারেট, ঘুম আসে। মনে হয়, এখানেই শুয়ে থাকবো, আর কোনোদিন

কোথাও যাবে না। বহুদিন আগে আমি এখানেই ছিলাম, কেন দূরে চলে গিয়েছিলাম ভুল করে? আর ভুল করবো না। পাতার ফাঁক দিয়ে একটি রোদের রেখা এসে পড়ায় আমি দু'হাতে চোখ চাপা দিই।

আমার এই অরণ্য বৈরাগ্য মাত্র দেড়ঘণ্টা স্থায়ী হয়। অতুল ওঝা ঠিক আমাকে খুঁজে বার করেছে। ডাক বাংলোতে ততক্ষণে খিচুড়ি রান্না তৈরি বলে সে আমাকে তাড়া দেয়।

আমিও উঠে পড়ি। এবার ফিরতে হবে। ফিরতে তো হয়ই।

নদীপথে সুন্দরবন

নদীর নাম হাতানিয়া-দোয়ানিয়া। কোনো নদীর এমন অদ্ভুত নাম আমি আর শুনিনি। কী এর মানে? কোন উদ্দাম কল্পনায় এরকম নাম দেওয়া যায়? অথচ নামটা বেশ সুন্দর, বেশ ঘরোয়া, খুব আপন আপন। সুন্দরবন এলাকায় অনেক নদীর নামই খুব মধুর। যেমন ঠাকুরান, যেমন মৃদঙ্গভাঙা। তবু হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নামটিই আমার বেশী পছন্দ। এর সমতুল্য নামের আর একটা নদী আমি পেয়েছিলাম, সেটি আসামে, তার নাম ঝাটিংগা।

হাতানিয়া-দোয়ানিয়া ছোট নদী হলেও বেশ তেজী। কলকাতা থেকে মাত্র সত্তর-আশী মাইল দূরে সমুদ্র থাকলেও আমরা যে সরাসরি বাসে চেপে বা গাড়িতে সমুদ্রের কাছে পৌঁছে যেতে পারি না, তার কারণ এই নদীটি শুয়ে আছে নামখানার পাশে। এর ওপর একটা সেতু বানানো যায় না? যায় নিশ্চয়ই, তবে যেমন তেমন সেতু বানালে চলবে না, সেটি বানাতে হবে বেশ উঁচু করে কারণ এই নদী

, দিয়ে অনেক বড় বড় মাছবাহী নৌকো যায়, স্থানীয় বাণিজ্যের জন্য যে-গুলি খুব জরুরী। তবু সেরকম একটা সেতুও কি বানানো যায় না? যাবে না কেন, কিন্তু কে-ই বা তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে।

হাতানিয়া-দোয়ানিয়ার বুকে একটা ছোট্ট ছিমছাম সপ্রতিভ লঞ্চে চড়ে যাত্রা শুরু হলো। বিকেলের পাতলা রোদকে চাদরের মতন উড়িয়ে সুপবন বইছে। আমরা কয়েক বন্ধু লঞ্চের ওপরের ছোট ক্যাবিনে জমিয়ে বসলাম। খানিকটা দূর যেতেই নদীর দু'ধার গৃহ-বিরল হয়ে এলো, ধু-ধু করা মাঠ, মাঝে মাঝে এক-একটা একলা গাছ। নদীর ধারে এখানে সেখানে প্রতীক্ষমান এক পায়ে-খাড়া-হয়ে থাকা বক। পরিচিত দৃশ্য।

এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা এসে পড়লাম একটা বড় নদীতে। এ নদীর নাম সপ্তমুখী। নদী তো নয়, গোলোকধাঁধা। সাতনরী হারের মতন নদীটি ছড়িয়ে আছে, এর কোন মুখ যে কোথায় গিয়ে পড়েছে, একবার-দুবার যাতায়াতে তা বুঝে ওঠা দুঃসাধ্য।

এবার আর নদীর দু'ধার রুক্ষ নয়, ঘন গাছের দেওয়াল। আমরা ঢুকে পড়েছি সুন্দরবনে। বুকের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা, চোখ দুটি যেন

সব কিছু হাঁ করে গিলতে চায়। এর আগে আমি আসাম, বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশে অনেক জঙ্গলে ঘুরেছি, এমন কি জঙ্গল দেখতে গেছি সুদূর আন্দামানেও, কিন্তু ঘরের কাছেই সুন্দরবন, পৃথিবীর বিখ্যাত অরণ্যগুলির একটি তা-ই আমার দেখা হয়নি এতদিন। এক একটা ব্যাপার ঠিক যেন হয়ে ওঠে না। যেমন, আমি শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাস-খানা পড়িনি। শরৎচন্দ্রের অন্য সব বই একাধিকবার পড়া, অথচ এই বইখানা হাতের কাছে পাইনি বা যে-কারণেই হোক, পড়া হয়ে ওঠেনি। লোকে যখন 'গৃহদাহ' নিয়ে আলোচনা করে, চুপ করে থাকি। তেমনি সুন্দরবন সম্পর্কেও।

আমরা যে-দিকটায় যাচ্ছি, সেদিকটা সুন্দরবনের আসল ভয়াবহ দিক নয়। ক্যানিং থেকে গোসাবা হয়ে ঢোকা যায় নিবিড় সুন্দরবনে, সেখানকার চামটা ব্লক ইত্যাদি রোমহর্ষক জায়গা। সেদিকে এখনো যাওয়া হয়নি, একদিন যাবো নিশ্চয়ই। অবশ্য আমরা যেদিকে চলেছি, সেদিকেও ধনচে ব্লকে বাঘ আছে। তাই নামখানায় টাইগার প্রজেক্টের বোর্ড ঝোলে।

ছলাৎ ছলাৎ করে ঢেউগুলো ধাক্কা মারে তীরের নরম মাটিতে। মাঝে মাঝে ঝুপ ঝুপ করে পাড়

ভেঙে পড়ে। সেইদিকে তাকিয়ে আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। এক একজনের এক একরকম অনুষঙ্গ। আমার ছেলেবেলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নদী-নালা-খাল-বিল। জলের দেশে বাল্য ও কৈশোরের কিছু বছর কাটিয়েছি। এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে খেলা করতে যাবার সময় মাঝখানের খানিকটা জায়গা সাঁতরে পার হয়ে যেতে হতো। একা একা ঘুরে বেড়িয়েছি নৌকোয়, ছোট খাল, দু'পাশে ঝুঁকে পড়েছে গাছপালা, স্বচ্ছ জলের মধ্যে দেখা যায় খলসে আর চাঁদা মাছ। (খলসে মাছ কি পৃথিবী থেকে নিঃশেষ হয়ে গেছে? বহুকাল দেখিনি।) ফরিদপুরে আমাদের গ্রাম থেকে কয়েক মাইল দূরে ছিল এক দুর্ধর্ষ নদী, নাম আড়িয়েল খাঁ—পাড় ভাঙার জন্য বিখ্যাত। কতদিন সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে দেখেছি ঝুপঝাপ করে পাড় ভেঙে জলে পড়ে যাচ্ছে। তখন নদীর কূল ভাঙার সঙ্গে জীবন বা সংসারের কোনো উপমা মনে আসতো না, এমনিই দেখতে দেখতে শিহরণ জাগতো।

—ঐ যে একটা কুমীর।

ডেক থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠলেন। কুমীর দেখার জন্য আমরা হুড়মুড় করে বাইরে এলাম। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বরুণ চৌধুরী, তপন

বন্দ্যোপাধ্যায়, ও আমি। এছাড়া সেচ ও শিল্প, বিভাগের কয়েকজন অফিসার, আমরা যাঁদের অতিথি। কিন্তু আমরা ঠকে গেলাম, চিৎকারকারী আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছিলেন। কুমীর টুমির কিছু নয়, চরের ওপর পড়ে আছে এক খণ্ড পোড়া কাঠ। কুমীর এরকমভাবে শুয়ে থাকে বটে কিন্তু আমাদের খুশী করার জন্য সেদিন কোনো কুমীর একবারও চরের ওপর রোদ পোহাতে এলো না। আমরা ক্যাবিনের জানলা দিয়ে এমন ব্যগ্রভাবে তাকিয়েছিলাম যেন যেকোনো মুহূর্তেই একপাল হরিণ কিংবা একটা জ্যান্ত বাঘ দেখে ফেলবো। কিন্তু একটাও জনপ্রাণী চোখে পড়ে না। শুধু একটানা বোবা জঙ্গল।

প্রথম দর্শনে সুন্দরবনকে একটুও সুন্দর লাগে না। মনে মনে আমি এই অরণ্যের অন্য একটি চিত্র এঁকে রেখেছিলাম। বস্তুত, আগেকার দেখা অন্য কোনো বনের সঙ্গেই সুন্দরবন মেলে না। অন্য সমস্ত নিবিড় বনে দেখেছি বিশাল বিশাল বনস্পতি, শাল, সেগুন, জারুলের গগনচুম্বী স্পর্ধা। কিন্তু সুন্দরবনের গাছগুলো ছোট ছোট, একতলা দেড়তলা বাড়ির চেয়ে বেশী উঁচু নয়। ভেড়ার লোমের মতন অত্যন্ত ঘনভাবে জড়ামড়ি করে আছে গাছগুলো। দেখলেই বোঝা যায়, তারা

অত্যন্ত জেদী ও শক্তিশালী, তাদের মোটামোটা শেকড় লম্বা হয়ে মাটির ওপর দিয়ে এগিয়ে এসেছে অনেকখানি। জোয়ারের সময় নদী অনেকটা ঢুকে যায় বনের মধ্যে, আবার জল নেমে আসার পর জমে থাকে থকথকে কাদা, সেই কাদা ফুঁড়ে মাথা উঁচু করে থাকে অজস্র শূল। এবং সেই কাদার ওপরে কানকো দিয়ে হাঁটা চলা করে এক রকমের মাছ। মেঘ ডাকলে কই মাছকে অনেক সময় ডাঙার ওপর দিয়ে চলতে দেখেছি—এছাড়া যখন তখন স্থলে ভ্রাম্যমাণ এই একটাই মাছ আমার চোখে পড়েছে চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন জায়গায় যে মাছের সঠিক বাংলা নাম কেউ জানে না, এক একজন এক একরকম বলে। নোনা জল ঢুকলে ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়ে যায়, আর সেই নোনা জল খেয়েই সুন্দরবনের গাছপালা এত তেজী ও স্বাস্থ্যবান। শুনেছি সুন্দর ওরফে সুঁদরি গাছের জন্যই সুন্দরবন নাম। সে গাছ একটাও দেখলাম না। শোনা গেল, পূর্ববাংলা ওরফে বাংলাদেশের দিকে কিছু আছে। এ পাশে আর চোখে পড়ে না। আর এক রকম গাছ খুব বেশী, যার স্থানীয় নাম বাইন। আর সব গাছের নাম জানি না।
নদীর ধারের দিকের গাছগুলি অধিকাংশই

হিন্তাল বা হেঁতাল, এরকম শুনলাম। আবার অবাক হবার পালা। মনসামঙ্গল কাব্যে পড়েছিলাম, চাঁদ সদাগরের হাতে সব সময় একটা হিন্তালের লাঠি থাকতো। আগে জানতাম না হিন্তাল গাছ কী রকম, কিন্তু চাঁদ সদাগরের লাঠি নিশ্চয়ই একটা বেশ শক্তপোক্ত জিনিস হবে। কিন্তু এ গাছগুলো তো বেঁটে ঝোপের মতন। অনেকটা বেত ও খেজুর গাছের সংমিশ্রণ বলে মনে হয়। পাতাগুলো সবুজ হলদেতে মেশানো, বাঘের ক্যামুফ্লাজের পক্ষে আদর্শ। বাঘেরা এই হিন্তালের ঝোপেই লুকিয়ে থাকতে ভালোবাসে। পরে অবশ্য কাছ থেকে দেখেছি, হিন্তালের দু'একটা ডাল বেশ লম্বা হয়, তা দিয়ে ভালো লাঠি বানানোও যায়। হেঁতালের ঝোপগুলো দেখে মনে পড়ছিল মানগ্রোভের কথা, যা প্রচুর দেখেছি আন্দামানে। সেখানে অবশ্য নদী নেই, খাঁড়ি বা ক্রীক। তার মধ্যে এক গলা নোনা জলের মধ্যে দাঁড়িয়েও মানগ্রোভগুলোর ডাকাতের মতন স্বাস্থ্য।

খানিক বাদেই অন্ধকার হয়ে এলো। এখন দু'পাশে শুধু নিবিড় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। একটাও বাঘের ডাক শুনিনি তবু কী রকম গা ছমছম করে।

নদীর বুকে আমাদের লঞ্চের জোরালো সার্চলাইট একটা আলোকপথ তৈরি করে রেখেছে, তাতে মাঝে মাঝে দেখা যায়, দু'একটা মাছ ধরার নৌকোর টিমটিমে আলো। দূরে এক জায়গায় দেখা যায় জলের বুকে যেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। না আলেয়া নয়, কাছে গেলে দেখা যায়, একটা বড় স্টিমার বা গাধাবোট, তাকে ঘিরে সাত আটটি নৌকো। এরা বাংলাদেশের ব্যাপারী এরকমভাবে থেমে থেমে সাত আট দিনে পৌঁছোয়। এখানকার ডাঙায় যেমন বাঘ-কুমীর, তেমনি জলে বড় ডাকাতেব উপদ্রব।

ওয়ালস ক্রীক, কারজন ক্রীক, চালতাবুনিয়া, জগদ্দল—এইসব অদ্ভুত নামের খাঁড়ি-নদীর পাশে পাশে পাথরপ্রতিমা, শিবগঞ্জ, কিশোরী নগর—এ ধরনের নামের গ্রাম। এরই মধ্যে একটি ভাগবতপুর ; এখানে আছে কুমীরের চাষ। আমরা ভাগবতপুরে দিনের আলো থাকতে থাকতেই একবার লঞ্চ থামিয়ে নেমে পড়েছিলাম। লঞ্চ থেকে একটা কাঠের তক্তা বেয়ে নামতে গিয়ে একজন পড়লো কাদার মধ্যে, আমি ভাঙা-ঝিনুকে পা কেটে ফেললাম। ভাগবতপুর—এরকম জমকালো নাম সত্ত্বেও ঘড়বাড়ি ক্বচিৎ

চোখে পড়ে। এখানে নারকোল চাষের সরকারী পরিকল্পনায় খুব ধুমধাম করে নারকোলের চারা লাগানো হয়েছিল কয়েক হাজার। তার অধিকাংশই শুয়োরে খেয়ে গেছে কিংবা লোকে চুরি করে নিয়ে গেছে। কুমীর প্রকল্পটি অবশ্য সত্ত তৈরি হচ্ছে। পৃথিবীর অনেক দেশে এখন আর কুমীর নেই, তাই ভারত সেই সব দেশে কুমীর বিক্রি করে বিদেশী মুদ্রা আনবে। বাঘ-সিংহ-কুমীর জাতীয় প্রাণীরা স্মরণাতীত কাল থেকে এই সেদিন পর্যন্ত ছিল মানুষের শত্রু, মানুষ ওদের হাতে মরেছে কিংবা ওদের মেরেছে। এখন সেই মানুষই যত্ন করে ওদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। এখন বাঘ যদি মানুষ মারে, তার কোনো শাস্তি হবে না, কিন্তু মানুষ যদি বাঘ মারে তার জেল হবে নির্ঘাৎ। মানুষ বড় মজার জাত।

সুন্দরবনের নানা জায়গা থেকে ধরে আনা হচ্ছে কুমীর, কিংবা খুঁজে আনা হচ্ছে কুমীরের ডিম। তারপর জলের উত্তাপ মেপে, তাদের রুচিমতন খাদ্য দিয়ে অনেক তরিবৎ করে লালন করা হচ্ছে তাদের। পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট মেশানো জলে পা ধুয়ে আমরা ঢুকলাম একটা হলঘরের মতন খাঁচাঘরে কুমীরের বাচ্চা দেখতে। চল্লিশ বেয়াল্লিশটা বাচ্চা কুমীরকে ডিম ফুটিয়ে রাখা

হয়েছে বিভিন্ন চৌবাচ্চায়। এক একটা গিরগিটির চেয়ে একটু বড়, কাছে গেলেই ধারালো দাঁত মেলে হাঁ করে আসে। একবার ধরতে পাবলে খুবলে মাংস তুলে নেবে। আমরা মুখ দিয়ে উৎকট শব্দ কবে ওদের ভয় দেখাই। একসঙ্গে এতগুলো কুমীরের বাচ্চা। জীবনে আরও কত কিছু দেখবো।

সন্ধে হবার আগেই লঞ্চে ফিরে এলাম।

আমাদের গন্তব্য সীতারামপুর। সেখানে সেচ বিভাগের একটা ছোট বাংলো আছে। এর পর আর জনবসতি নেই বললেই চলে। অদূরে সমুদ্র। আমরা কয়েক বন্ধু রাত্রে লঞ্চেই থেকে গেলাম হৈ হৈ করে জেগে, আধো-ঘুমিয়ে। ওপারের ধনচে জঙ্গলের বাঘরা আমাদের সেই কোলাহলে বিরক্ত হয়েছিল কিনা কে জানে।

সকালবেলা সাগরের মোহনা পর্যন্ত যাবার চেষ্টা করেও ফিরে আসতে হলো। জোয়ারের জল ঢুকছে তার মধ্যে আমাদের লঞ্চটা মোচার খোলার মতন টাল-মাটাল। সারেং চটপট লঞ্চের মুখ ঘুরিয়ে ফেললো।

ফেরার পথ ওপারের জঙ্গল ঘেঁষে। পারমিট

ছাড়া এই জঙ্গলে প্রবেশ নিষেধ। আমাদের কাছে সেসব কিছুই নেই। ঠাসা, জমজমাট অত্যন্ত বন্য ধরনের বন, এর ভেতরে হাঁটতে গেলে দু'হাতে বন ঠেলে ঠেলে যেতে হবে। তবু একবার যেতে ইচ্ছে করে। চরের ওপর বসে আছে এক ঝাঁক খয়েরি রঙের বুনো হাঁস, হাওয়ায় গাছের ডগাগুলো দুলে দুলে উঠছে, জোয়ারের জল বেড়ে উঠছে লকলক করে। এ সময় কোনো ভয়ের চিন্তা মনে আসে না। ইচ্ছে হয় এক ছুটে জঙ্গলটা একবার ঘুরে আসি।

সারেংকে বললাম, একবার লঞ্চটা থামান না। এখানে তো দেখবার কেউ নেই। আমরা একটুখানি ঘুরেই চলে আসবো।

সারেং কিছুতেই রাজি নয়। মানুষটি বেশ সদালাপী, এর আগে আমাদের অনেক উপদ্রব সহ্য করেছেন। কিন্তু এবার বললেন, না বাবু, আপনারা জানেন না সুন্দরবনকে বিশ্বাস নেই। কখন কোথা থেকে যে বিপদ ঘটে যায়, কিছুই বলা যায় না। এই তো সেদিন একজনকে···পারে নামা মাত্তরই বাঘ এসে···

এর পর তিনি আমাদের একটি রোমহর্ষক কাহিনী শোনান। সুন্দরবনের বাঘের এরকম অত্যাচার কাহিনী আমরা আগেও পড়েছি বা শুনেছি। এই টাটকা কাহিনীটিও যে সত্য তার প্রমাণ হিসেবে, সারেং বললেন, আহত ব্যক্তিকে এখনো মুমূর্ষু অবস্থায় কাকদ্বীপের হাসপাতালে দেখা যেতে পারে। অবিশ্বাস করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবু আমরা একটু ক্ষুন্ন হয়ে রইলাম।

একটু পরে দেখি যে একটা খুব সরু খাঁড়ি দিয়ে একটা ছিপ নৌকোয় দু'তিনজন লোক ঢুকছে ঐ জঙ্গলে। আমরা বললাম, ঐ যে লোকগুলো যাচ্ছে ওদের ভয় নেই ?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সারেং বিচিত্রভাবে হেসে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তখনই বুঝলাম আমাদের মূর্খামি। যারা প্রতিদিন না খেতে পেয়ে মরে যাবার দুশ্চিন্তা নিয়ে বেঁচে আছে, তাদের কি বাঘের ভয় পেলে চলে ? এ আর নতুন কথা কী ?

জীবন্ত মরুভূমি

'কাল সকালে মরুভূমি দেখতে যাবে?'
ভাবছিলুম কার সঙ্গে যাবো। অ্যারিজোনায় এসে ক্যাকটাসের মরুভূমি না দেখার কোনো মানে হয় না। ভুবন বিখ্যাত এই মরুভূমি, এমন আর দেখা যায় না কোথাও। এ মরুভূমি শুধু বালুকাময় নয়। অথচ গাড়ি ছাড়া যাবার উপায় নেই। এমন সময়ে কানের কাছে দৈববাণীর মতো ড্রুমণ্ডের প্রশ্ন।
ড্রুমণ্ড হাডল একজন তরুণ কবি, আমার চেয়ে বছর দু'একের ছোটো হবে হয়তো (আমি এই জুলাই-এ উনত্রিশ)। পাঁচ বছর আগে বিয়ের পর ড্রুমণ্ড হানিমুন করতে গিয়েছিল কম্বোডিয়া ও ভারতবর্ষে। রথের মেলার সময় পুরীতে গিয়েছিল আসল সমুদ্র নয়, জনসমুদ্র দেখতে।
'তবে এমন ম্যালেরিয়ায় ভুগেছিলাম যে, ভ্রমণের অর্ধেক আনন্দই মাটি হয়ে গিয়েছিল—ও বললো।
বললুম, 'ভাখো, আমাদের সরকারী হিসেবে ম্যালেরিয়া ভারতবর্ষ থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেছে, ওটা বোধ হয়—'

—কম্বোডিয়া থেকে হয়েছিল, আমারও তাই মনে হয়।

—ভাগিাস তুমি বললে, তোমরা বললে দোষ নেই। আমি বললেই অন্য দেশের নিন্দে হয়ে যেতো। একেই তো প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের বন্ধুত্ব নেই বললেই চলে।

বাড়িতে বাঘ পুষেছে ড্রুমণ্ড। সত্যিকারের বাঘের বাচ্চা, মরুভূমি থেকে ধরা। ওর স্ত্রী, ভারী লক্ষ্মী, শ্রীময়ী মেয়েটি, পরীক্ষার জন্য খুব মন দিয়ে পড়াশুনা করছিল, আমি যেতেই শিষ্টভাবে উঠে দাঁড়াল, পাশ থেকে ঘর্-রর্-র্ করে উঠলো বাঘের বাচ্চা। 'ভয় পেয়ো না, আমাদের বেড়ালটা কারুকে কিছু বলে না!'

চারটে কাবুলি বেড়াল সাইজের ঐ আট মাসের বাঘের বাচ্চাটা—দেখেই আমার হাড় হিম। একটা বড়ো ঘরে আলাদা করে রেখেছে ওটাকে—ওরা দু'জনে বেড়ালের মতই ওটার সঙ্গে খেলা করে। ব্যাপারটা গোপন, পুলিসে জানতে পারলে ধরে নিয়ে যাবে। আমি এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে সেই গল্পটা বললুম, সেই যে কোন এক ভদ্রলোক বাঘ পুষেছিলেন, তারপর বাঘ সেই লোকটার হাঁটু চাটতে চাটতে হঠাৎ রক্তের স্বাদ পেয়ে ঘ্যাঁক করে কামড়ে দেয়। ওরা দু'জন হেসে

বললো, একজন লোক ফেইল করেছে বলে আমরা পারবো না, তার কি মানে আছে। মানুষ অ্যাটমকে পোষ মানাচ্ছে—বাঘ তো দূরের কথা। তুমি কাছে এসে ওর গায়ে হাত দিয়ে দেখো না, কিছু বলবে না।'

আমি বললুম, 'না ভাই থাক, দূর থেকেই দেখছি। এমনিতেই আমার শরীরে আঠারো ঘা আছে।'

সকাল নটা আন্দাজ ড্রমণ্ডের ভ্যান নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। অ্যারিজোনার টুসন্ শহরের একেবারে গা থেকেই মরুভূমি আরম্ভ। মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো পাহাড়—তার ওপাশে মেক্সিকোর সীমানা।

—মরুভূমি সম্বন্ধে যা ভাবছো তা নয়, ড্রমণ্ড বললো, 'অন্যরকম, দেখো, তোমার ভালো লাগবে। কিন্তু একটা কথা, মরুভূমি দেখে কবিত্ব করা চলবে না। বিশেষত এলিয়টের ওয়েস্ট ল্যাণ্ড আবৃত্তি করা একেবারেই নিষেধ। আমি অনেক শুনেছি।'

—'সুন্দর দৃশ্য দেখলে আমার মনে মোটেই কবিত্ব জাগে না। আমার ক্ষিদে পায়।'

—'কি ?'

— 'মাইরি বলছি, আমার ক্ষিদে পায়। অর্থাৎ আমার হৃদয় কাজ করে না, তার একটু নিচে, পেটে প্রতিক্রিয়া হয় আমার।

ও হেসে বললো, 'ভয় নেই, আমার বউ কয়েকটা হ্যামবার্গার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে।'

বিষন জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল। আমি দু'পাশের দৃশ্য দেখার বদলে ড্রুমণ্ডকে দেখছিলুম। একটা ব্লু জিন আর গেঞ্জি পরেছে, মাথার চুল এলোমেলো। সুঠাম স্বাস্থ্য ও সাহস, বাড়িতে পরমাসুন্দরী স্ত্রী ও বাগান, বাঘ পুষেছে—এই একজন আমেরিকার তরুণ কবি। ভারী চমৎকার খোলামেলা ছেলে ড্রুমণ্ড, কিন্তু একটা দোষ: যখন খুব উৎসাহে কথা বলে, তখন খাঁটি ওয়েস্টার্ন অ্যাক্সেন্ট বেরিয়ে পড়ে—আমার পক্ষে বোঝা দুষ্কর হয়। ও বললো, 'এখানে খুব জলের অভাব।' তারপরই গড়গড় করে কি শুরু করলো—আমি কিস্যু বুঝতে পারলুম না, তবুও সেনটেন্সের মধ্যে কমা, ফুলস্টপ বসাবার মতো মাঝে মাঝে হুঁ হ্যাঁ, 'ও তাই নাকি' করে যেতে লাগলুম। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'তোমাদের দেশে এ সম্বন্ধে কি করো?'

আমি একেবারে গভীর জলে পড়লুম। যদিও বুঝতে পারলুম, ব্যাপারটা জল সম্বন্ধেই। এস্টিমেশন, ড্রিলিং এই সব শব্দ শুনেছি বটে। আমতা আমতা করে বললুম, 'আমি ঠিক—'

—'ঠিক কোন জায়গা খুঁড়লে জল পাওয়া যাবে কি করে বুঝতে পারো?'

বললুম, 'আমি ঠিক ও বিষয়ে কিছু জানি না। আমি জন্মেছি পূর্ববঙ্গে. সেখানে জল থাকাটাই একটা সমস্যা, না-থাকা নয়। রাজস্থানের দিকে ও সমস্যা আছে বটে—কিন্তু ওরা কি করে আমি জানি না।' একটু থেমে আবার বললুম, 'একটা কথা বলব ? তোমাদের দেশের অনেক কবির সঙ্গে কথা বলে দেখেছি—তাঁরা কবিতা ছাড়াও আরও অনেক বিষয় জানে। স্পেসশীপের কোথায় কোথায় শূন্য স্টেশন হওয়া দরকার, হায়ারোগ্লিফিকসের পাঠান্তব, নদীর তলায় সুড়ঙ্গ বানাবার কি কি সমস্যা, বাঁদরের মস্তিষ্ক টেস্ট টিউবে আলাদা বাঁচিয়ে রাখার পব সেই অশরীরী মস্তিষ্কের দুঃখ ও আনন্দ বোধ থাকে কি না, ইন্দোনেশিয়ার প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা—এই সব। আমাদের দেশের কবিরা একটু হ্যালা ক্যাপা টাইপ, জেনারেল নলেজে শূন্য, ধুতি পাঞ্জাবীতে জেবড়ে থাকে, এক চেয়ারে বসলে ঘণ্টা পাঁচেকের কমে উঠতে চায় না, কবিতা ছাড়া আর কোনো বিষয়েই কিছু জানে না —হয়তো সেই জন্যই তোমাদের চেয়ে ভালো কবিতা লেখে।'

আমার শেষ কথা শুনে ও চমকে আমার দিকে তাকালো। তারপরই ঝকঝক করে হেসে উঠলো। বললো, 'কি জানি, হয়তো সত্যি। আমি বেশী

।ড়িনি—বিশেষ করে তোমাদের ঐ হরিবল্
'নস্লেশনে টেগোরের লেখাও আমার মোটেই
ভালো লাগেনি। কিন্তু তোমাদের একটা
অসুবিধে আছে—যেটা আমাদের নেই। তোমাদের
কাঁধের উপর চেপে আছে তোমাদের ঐতিহ্য,
তোমাদের ধর্ম। তোমরা নির্জন হতে পারো না।
কিন্তু আমাদের ওসব ঝামেলা নেই—আমরা সবাই
গভীর অন্ধকারের মধ্যে হাঁটছি, সুতরাং আমাদের
প্রতি পদক্ষেপে নিজেকে খুঁজতে হচ্ছে—আমরা
নির্জন আধুনিক মানুষ—সকলেই।'

—'কিন্তু ঐতিহ্যের প্রতি তোমাদেরও লোভ কম
নয়। তোমরা—'

—ছাখো, ছাখো, ঐদিকে ছাখো।

আকাশে একটা বড়ো সাইজের পাখি দেখতে
পেলুম। জিজ্ঞেস করলুম, 'ওটা কি?'

—গোল্ডেন ঈগল্।

বিশাল ডানাওয়ালা সোনালী ঈগল এই অঞ্চলে
এখনও দেখতে পাওয়া যায় শুনেছিলুম, আগে
কখনও দেখিনি। কিন্তু 'গোল্ডেন ঈগল' এ নামটা
খুব চেনা, কলকাতায় বহু গ্রীষ্মের দুপুরবেলা ও নামে
চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেছে।

তাড়াতাড়ি একটা জোরালো দূরবীন বার করে
ড্রুমণ্ড ছুটলো ঐ পাখিটার পিছনে গাড়ি নিয়ে।

এবড়ো খেবড়ো পাহাড়ী রাস্তায় কি দুঃসাহসিক গাড়ি চালানো—এক হাতে স্টীয়ারিং, এক হাতে দুরবীন নিয়ে বাইরে ঝুঁকে—চোখ রাস্তায় নয়, আকাশে। কিন্তু অমন দুঃসাহসীর পাশে বসেছিলাম বলে আমারও ভয় করলো না। কি ভয়ংকর গতি ঐ ঈগলের—ঘুরতে ঘুরতে প্রায় মহাশূন্যে বিন্দুর মতো হয়ে গেল হঠাৎ আবার ঝুপ করে নেমে এলো খুব নীচে—শোঁ শোঁ করে আবার পেরিয়ে গেল পাহাড়ের পর পাহাড়, মিলিয়ে গেল দিগন্তে কয়েক মিনিটে। আমরা গাড়ি নিয়েও ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারলুম না।

ড্রুমণ্ড বললো, 'ঐ ঈগল আমেরিকার প্রতীক চিহ্ন।'

গাড়ি উঠে এসেছিল একটা ছোটো পাহাড়ের মাথায়। ডানদিকে তাকিয়ে বিশাল মরুভূমি চোখে পড়লো। সত্যিই, আমাদের কল্পনায় যে মরুভূমির ছবি আছে—অর্থাৎ মাইলের পর মাইল হলুদ বালি, গনগনে হাওয়া—এ মরুভূমি সে রকম নয়। এ মরুভূমি জীবন্ত। হঠাৎ দেখলে মনে হয় সারা ভূমি জুড়ে অসংখ্য সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে। ওগুলো ক্যাকটাস, পশ্চিম অঞ্চলের বিখ্যাত ক্যাকটাস, সরল, দীর্ঘ প্রত্যেকটা অন্তত দেড়শো-দুশো বছরের

রোনো। প্রথম শাখা বেরোয় পঁচাত্তর বছরে—
ঐ শাখা বা ডানা গুনে বয়েস বোঝা যায়।
এগুলোকে বলে সাউয়ারো (স্প্যানিশ নাম ঃ
Saguaro জি উচ্চারণ হয় না)—গ্রীষ্মকালে ফুল
ফুটতে থাকে—বীভৎসতার বদলে এ মরুভূমিকে
মনোরমই দেখায়। মরুভূমি নয় ; পুরোটাই যেন
এক মরুদ্যান। এ ছাড়া আছে অন্য নানা জাতের
ক্যাকটাস, প্রিক্লি পিয়ার—বুনো শেয়াল, কাঁকড়া
বিছে, ছোটো বাঘ, র‍্যাটেল স্নেক (ল্যাজে যে-
গুলোর খটখট আওয়াজ হয়), হরিণ। জল নেই,
ফসল হয় না—কিন্তু মরুভূমির বদলে পোড়ো জমি
কথাটাই মনে আসে। কিন্তু ড্রুমণ্ড আগেই
এলিয়টের ওয়েস্টল্যাণ্ডের উল্লেখ করতে বারণ
করেছে।

এই মরুভূমির দৃশ্য আমাদের অদেখা নয়।
আমেরিকার যাবতীয় ওয়েস্টার্ন ছবিতে দেখেছি,
ঘোড়া ছুটোচ্ছে কাউবয়রা, কথায় কথায় গোলাগুলি
খুনোখুনি—এখানকার রেড ইণ্ডিয়ানের প্রায়
সবাইকে মেরে ফেলে এখন মিউজিয়মে পুরেছে।
অনেক রক্তপাত হয়েছে। এখানে রেড
ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে, তারপর স্প্যানিশদের সঙ্গে,
তারপর সিভিল ওয়ারে। মরুভূমি মাত্রই রক্ত
লোভী, আরবের মরুভূমিও কম রক্ত শোষেনি।

ড্রুমণ্ড জিজ্ঞেস করলো, 'কেমন লাগছে?'

বললুম, 'ভাই ড্রুমণ্ড, যদি সত্য কথা বলতে হয়—এ সব-দৃশ্যই আমি আগে ছবিতে দেখেছি। এ দেখার চেয়ে, ছবিতে বেশী সুন্দর লেগেছিল।'

—'যাঃ, তা হয় নাকি?'

—'তোমাকে ঠিক যুক্তি দেখাতে পারবো না। এ জায়গাটা বড় বেশী বিশাল আমার পক্ষে, আমি ছোটো করে, ফ্রেমের মধ্যে না দেখতে পেলে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারি না।'

—দুঃখের বিষয়, আমি ক্যামেরা আনিনি।

'আরেকদিন পাহাড়ের ওদিকে গুহা দেখতে যাবো, তখন।' (পরে একদিন সেখানে অসিত রায় ও সুবোধ সেনের সঙ্গে গিয়েছিলাম)।

ছেলেমানুষের মতো ড্রুমণ্ড বললো, 'জানো এখানে হরিণ আছে? হয়তো এই মুহূর্তে দশটা হরিণ দশ দিক থেকে আমাদের দেখছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি না।'

আমাদের মোটামুটি গন্তব্য ছিল ডেজার্ট মিউজিয়ম—মরুভূমির ঠিক মধ্যে আসল পরিবেশে মরুভূমিতে যা কিছু পাওয়া যায়—তার প্রদর্শনী। ড্রুমণ্ড জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কিছু মনে করবে, যদি আমরা একটু ঘুরে যাই? ঐ ডানদিকের টিলাটা আমার দেখা হয়নি।'

আমি বললুম, 'না-না আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে ওটা দেখা হয়নি মানে? তুমি কি মরুভূমির সব জায়গা জানো নাকি?'

—'প্রায়, আমি প্রত্যেক সপ্তাহে এখানে আসি, এবং নানান জায়গা দেখি।'

– 'কেন?'

প্রথমে ও কারণটা বলতে চাইলো না। লাজুক হেসে আমতা আমতা করতে লাগলো। মুগ্ধ হবার জন্য মরুভূমিতে প্রতি সপ্তাহে আসার মতো এ রকম খেলো কবিত্ব ও করবে বলে আমার বিশ্বাস হলো না। পরে কারণটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

ড্রামণ্ড মরুভূমিতে সোনা খুঁজতে আসে। এই খোঁজা নতুন নয়। সোনার লোভেই সাদা চামড়ার লোকেরা আসে পশ্চিমে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত, তারপর একদিন দেখতে পায় প্রশান্ত মহাসাগর। সোনার লোভে কত হত্যাকাণ্ড হয়েছে নিজেদের মধ্যে। ভুলে গেছে মানুষের জীবন সোনার চেয়েও দামী। এতকাল সোনার লোভে এক পাল লোক মরেছে—সাদা হাড় ও কঙ্কালের স্তূপের মধ্যে ঝিক্‌ঝিক্ করেছে দু'একটা সোনার দাঁত। কিন্তু এখনো সোনার লোভে কেউ আসে জানতুম না, শেষে কি একটা পাগলের

পাল্লায় পড়লুম ! কিন্তু ড্রুমণ্ডের অমন সরল সুন্দর মুখে কোনো স্বর্ণলোভ দেখলুম না। সোনা নয়, সোনা খুঁজছে—এইটাই যেন বড় ব্যাপার। র‍্যাঁবোর কবিতার মতো : যখন আমি ফিরবো, আমি সোনা নিয়ে আসবো।

—'তোমার সত্যিই ধারণা এখানে সোনা পাওয়া যায় ?'

—'নিশ্চয়ই ! কত লোক ছুটির দিনে আসে সোনা তৈরি করতে। কিন্তু তারা সারাদিনে যতটুকু সোনা পায় বালি ছেঁকে—তাতে দিনের মজুরি পোষায় না। আমি খুঁজছি এমন একটা জায়গা—যেখানে অফুরন্ত সোনা। নিশ্চয়ই কোথাও আছে।'

পাকা রাস্তা ছেড়ে গাড়ি চললো পাহাড়ী পথে। ড্রুমণ্ডের গাড়িটাও ওরই মতো ডাকাবুকো। কড়কড়, মড়মড় শব্দ হতে লাগল, ডানদিকে বাঁদিকে বিষম হেলে পড়তে লাগলো, তবু চললো ঠিকই। শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় থামল। আর রাস্তা নেই। আমরা নেমে হাঁটতে লাগলুম। 'সাবধানে হেঁটো সুনীল, র‍্যাটেল্ স্নেক আছে খুব ! অবশ্য ভয় নেই—কামড়ালে মানুষ চট্ করে মরে না।' খুব একটা ভরসা পেলাম না যদিও ও কথা শুনে।

একটা ছোটো টিলা পেরতেই দূরে একটা বাড়ি চোখে পড়লো।

—'এখানে এই বিশ্রী মরুভূমিতে কে বাড়ি করেছে?'

—'জানি না, আমি আগে দেখিনি। তবে ভেবো না কোনো সাধু সন্ন্যাসী, তোমাদের ইণ্ডিয়ার মতো—নিশ্চই কেউ সোনার লোভে এসেছে!'

বাড়ির সীমানায় বহুদূর থেকে কাঁটা-তারের বেড়া। কোথাও কারুর কোনো সাড়া শব্দ নেই। আমরা দরজা ডিঙ্গিয়ে ভেতরে ঢুকলুম। হলিউডের সিনেমায় দেখা দৃশ্যের মতো—আমি প্রতি মুহূর্তে বন্দুকের গুলি আশা করছিলুম। কাছে এসে অবাক হয়ে গেলুম। বাড়িটা নতুন, কিন্তু সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। যেন কোনো অতিকায় দানব এসে মহা ক্রোধে ওটাকে ধ্বংস করেছে। কোনো ঘরের ছাদ নেই, দেওয়ালে বড়ো বড়ো ফুটো (বন্দুকের গুলির কিনা কে জানে!)—আসবাবপত্র ভেঙ্গে চুরে তছনছ করা। প্রচণ্ড রাগের সঙ্গে কেউ ভেঙ্গেছে নতুন রেফ্রিজারেটর—কিন্তু হাতুড়ি মেরে ভাঙ্গা হয়েছে বোঝা যায়, গ্যাসস্টোভের শুধু পাইপগুলো ভেঙে বিকল করা হয়েছে—নতুন কাঠের চেয়ার অথচ ভাঙা, সোফা কুশন ছুরি দিয়ে ফাঁসানো।

আমি ড্রুমণ্ডের মুখের দিকে তাকালুম। ও বললো 'কি জানি, হয়তো ঝড়ে ভেঙেছে—মাঝে মাঝে এখানে প্রচণ্ড ঝড় ওঠে। এখানে বাড়ি বানানোই বোকামি!'

আমি বললুম, 'না, ঝড় অসম্ভব। মানুষের কাজ।'

—'হতে পারে, একদল গ্যাংস্টার এসে লুটপাট করেছে। কেউ হয়তো এখানে ছুটি কাটাবার জন্য বাড়ি বানিয়েছিল। হয়তো কেউ থাকত না এখানে।'

ডায়নামো বসিয়ে ইলেকট্রিক কানেক্‌শন পর্যন্ত ছিল, তারগুলো দেয়াল থেকে ছেঁড়া, মেশিনটা তোবড়ানো। দেয়ালে কুৎসিৎ ছবি —তাই দেখে প্রাক্তন বাসিন্দাদের রুচির খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। সবই ন্যাংটো মেয়েমানুষ, কায়কটা খড়ি দিয়ে আঁকা, একটি স্ত্রীলোকের শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শ্ল্যাং ভাষায় নাম লেখা, যেন কারুকে শেখানো হয়েছে।

—'গুণ্ডারা এ সব জিনিসপত্র ভেঙেছে কেন—নিয়ে যেতে তো পারত?'

—'মরুভূমিতে এসব জিনিসের লোভে কে আসে, সবাই আসে সোনার লোভে।' ড্রুমণ্ড বিষম উৎসাহ পেয়ে গেল ব্যাপারটাতে—শখের

গোয়েন্দার মতো খুঁটিনাটি দেখতে লাগলো। এক-একটা জিনিস পায়—আর আমাকে ডেকে ডেকে দেখায়—আধপোড়া পিয়ানো, এক বাক্স ছেঁড়া জামা কাপড় এই সব। মরুভূমি দেখতে এসে কি এক রহস্যময় বাড়িতে এসে হাজির হলুম। হঠাৎ খানিকটা দূর থেকে ড্রুমণ্ড আমাকে ডাকলো। কাছে গিয়ে দেখলুম, ড্রুমণ্ড মাটিতে হাঁটুগেড়ে বসেছে। ওর সামনে একটা ছোট্ট কবর। একটা কাঠের ক্রুশে ছোট্ট একটা পতাকা —তাতে লেখা, 'এই ভয়ঙ্কর মরুভূমি আমাদের সাধের খোকনকে খুন করেছে। শ্রীমান ফ্রেডেরিক, (বয়স আট) ঈশ্বর তোমাকে আশ্রয় দেবেন।' তারিখ খুব টাটকা, মাত্র একুশ দিন আগের। ড্রুমণ্ড গম্ভীরভাবে বললো, 'চলো, আমরা এখান থেকে কেটে পড়ি। এখানে কোনো রহস্য আছে —শেষে আমরা পুলিস কেসে জড়িয়ে পড়ব।'

ঐ রহস্যময় বাড়ী পেরিয়ে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে আমরা অন্যদিকে নেমে গেলুম। বিশাল ক্যাক্টাসগুলো একটু আগেও যেন নিজেদের মধ্যে কি সব সব বলাবলি করছিল, আমাদের দেখে থেমে গেল। বিষম গরমে কান ঝাঁঝাঁ করছে। একটা নদীর খাতের মতো জায়গা

দেখলুম, মাঝে মাঝে বাঁধানো ঘাটের মতো, এক বিন্দু জল নেই। প্রাগৈতিহাসিক কালে হয়তো সেখানে নদী ছিল।

আমিই প্রথম সোনা আবিষ্কার করলুম।

আমি আস্তে আস্তে হাঁটছিলুম, মাঝে মাঝে বসছিলুম ক্যাকটাসের ছায়ায়, কাঁটা বাঁচিয়ে —ড্রুমণ্ড ছট্‌পুজোয় মানতকরা মেয়েমানুষদের মতো মাঝে মাঝেই শুয়ে পড়াছল মাটিতে— কোথাও গন্ধ শুঁকছে, কোথাও মাটিতে কানপেতে কি শুনছে এবং মাঝে মাঝে ওব সেই ইমোশনাল ইংরেজীতে (দুর্বোধ্য) কি সব বলছে। এমন সময় আমি বেশ একটা গোল, নধর, পাউডার পাফ (ফরাসীরা বলে শাশুড়ীর মাথা) ক্যাকটাসের তলায় দিব্যি একতাল সোনা দেখতে পেলুম। ঠিক একটা ছোটখাটো ফুটবলের সাইজ, রোদের আলো পড়ে ঝলসে দিচ্ছে! সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল—ড্রুমণ্ড নিশ্চই আমাকে আর্ধেক শেয়ার দেবে, তা হলে, ওটার দাম কত কে জানে—দেশে ফিরে অন্ততঃ বছর পাঁচেক আমাকে কোনো চাকরি করতে হবে না! সোনা, আমি সোনা পেয়েছি!

আমি চেঁচিয়ে বললুম, 'ড্রুমণ্ড ঐ দেখো!'

বিষম চমকে ও মুখ ফেরালে তারপর আমার আঙুল সোজা লক্ষ্য করে সোনার তালটা দেখতে পেয়ে ও

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললো, 'ওঃ তাই বলো। তুমি এমনভাবে চেঁচিয়ে উঠলে—আমি ভাবলুম সাপ না বাঘ! আমি আবার বন্দুকটা আনিনি!'

—'ও কি তবে?'

—'সোনা!'

কাছে গিয়ে ড্রুমণ্ড ওই জিনিসটাকে এক লাথি মেরে বললো, 'বাস্টার্ড।' সেই সোনার তালটা অমনি ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল ঝুরঝুরে বালির মতন। অথচ ঠিক সোনার তালের মতনই দেখাচ্ছিল। আমি বললাম, 'একি!' ও বললো, 'এই জিনিসগুলো কম ঝামেলা করে? এর নাম কি জানো,—বোকার সোনা, ফুল্'স গোল্ড। যা কিছু চক্‌চক্ করে তাই সোনা নয়। বছর দশেক আগেও এ জিনিস আবিষ্কার করে কত লোক নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করেছে।'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে আবার সেই সরল হাসি হেসে বললো, 'ভাগ্যিস তুমি ওটা দেখতে পাবার পরই পেছন থেকে আমাকে ছুরি মারোনি!'

বস্তুত, ব্যাপারটা এমন মোলাড্রামাটিক হলো যে তারপর থেকে আমার বিষম বিশ্রী লাগতে লাগল।

আর মরুভূমি দেখার সম্পূর্ণ ইচ্ছে চলে গেল আমার। ওটা দেখতে পাবার পর মুহূর্তে আমার বুকের মধ্যে যে দুম্‌দুম্‌ শব্দ হওয়া শুরু করেছিল— তা আর থামলো না। বিষম ক্লান্ত হয়ে পড়লুম। ড্রুমণ্ডকে স্বর্ণ-লোভী ভেবে মনে মনে একটু ক্ষীণ অবজ্ঞা কবতে শুরু কবেছিলুম—কিন্তু তখন, তারপর থেকে কোথা থেকে এক গভীর নিরাশা আমার বুক ভরে দিলে। যেন কেউ সেই মুহূর্তে কেড়ে নিল আমার পাঁচ বছর চাকরি না করার ছুটি, যেন পাঁচ বছর চাকরি করার পরিশ্রম একসঙ্গে সেই মুহূর্তে আমার কাঁধে চেপে বসলো।

আমরা ফিরে এলাম গাড়ির কাছে। ড্রুমণ্ডের বউ-এর বানিয়ে দেওয়া হ্যামবার্গার আর স্যাণ্ডউইচ খেলাম। গাড়ির পিছন দিকটা খুলে ড্রুমণ্ড কি যেন খেতে লাগলো চোঁ-চো শব্দে—মনে হলো যেন পেট্রল খাচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখলুম ওখানে আলাদা একটা জলের ট্যাঙ্ক আছে। ঘন ঘন মরুভূমিতে আসার জন্য পাকা ব্যবস্থা।

'ডানদিকের ঐ অঞ্চলটা একটু দেখেই আমরা যাবো মিউজিয়ামে। তুমি আসবে আমার সঙ্গে?'

—'না, আমি এখানে বসছি। তুমি ঘুরে এসো।'

—আমার ঘণ্টাখানেক লাগবে।

একটু দূরে যাবার পর আমি চেঁচিয়ে বললুম, 'ড্রুমণ্ড, সাবধানে ঘুরো। হারিয়ে যেও না—কিংবা, মরে যেও না। কারণ, আমি পথও চিনি না, গাড়িও চালাতে জানি না।'

একটু পরেই ড্রুমণ্ড মিলিয়ে গেল দূরে। আমি একা গাড়ির ছায়ায় বসলুম। চারিদিকে এমন নিঃশব্দ যে ভয় করতে লাগলো। হঠাৎ হাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, একটা শুকনো পাতারও শব্দ নেই। দূরে সেই পোড়ো বাড়িটা। আমি ওটার থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে বসলুম। দু'মানুষ-তিনমানুষ লম্বা ক্যাকটাসের সারি চলে গেছে মাইলের পর মাইল—সাণ্টা ক্যাটালিনা পাহাড় পর্যন্ত। নিস্তব্ধতা যেন জীবন্ত হয়ে ঘুরছে সেই মরুভূমিতে। আমার হাতঘড়ি নেই, সময় জানি ন। একমাত্র শব্দ শুনছি নিজের হৃৎপিণ্ডের—তখনও প্রবলভাবে দুম্‌দুম্‌ করছে।

একটু শব্দ হলেই এদিক ওদিক তাকাই। মনে হয় বুঝি কোনো র‍্যাটল স্নেক তাড়া করে আসছে। র‍্যাটল স্নেক আগে দেখেছি আমি, লেজের দিকটা শুকনো হাড়, কট্ কট্ কট্ কট্ আওয়াজ হয়। দেখলেই কেমন ঘেন্না লাগে।

লম্বা লম্বা ক্যাকটাসগুলো যেন এক দৃষ্টে দেখছে আমাকে। ড্রুমণ্ড কোথায় গেল? দু'বার ড্রুমণ্ড, ড্রুমণ্ড বলে চেঁচিয়ে ডাকলুম। কোনো সাড়া নেই। ড্রুমণ্ড যদি আর না ফেরে? মরুভূমি মধ্যে একলা দাঁড়িয়ে থাকার মতন একাকিত্ব বুঝি আর হয় না।

ক্রমশ দুর্বলতা বোধ এনে দিচ্ছে। মরুভূমিতে এতকাল যে সব অসংখ্য মানুষ মরেছে—তাদের সবার জন্য অসম্ভব দুঃখ বোধ করতে লাগলুম। ওপরের দিকে তাকান যায় না, আকাশ এত গরম। অপেক্ষার প্রতিটি মুহূর্ত মনে হতে লাগলো অসম্ভব লম্বা। এর থেকে ঘুমিয়ে পড়া ভালো আমার মনে হলো। গাড়ি মধ্যে ঢুকে লম্বা সীটে শুয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। ঘুমিয়ে আমি একটা জলে ডোবা মানুষের স্বপ্ন দেখেছিলাম সেদিন।

পৃথিবীতে, এত কাছে

দহিজুড়ি ছাড়িয়ে কিছুটা যেতেই জিপ গাড়িটা থেকে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করলো। ড্রাইভারেব পাশে আমি, তাবপর স্বাতী। পেছনে কল্যাণ এবং চারটি মুর্গী।
প্রথমে একটু একটু ধোঁয়া, তারপর মোষের শিং-এর মতন, তারপর কারখানার চিমনির মতন। আমরা টপাটপ নেমে পড়লুম, ড্রাইভার এসে বনেটটি খুলে ফেললেন। 'যত্র ধূমাৎ তত্র বহ্নি' লজিকের এই সূত্রটিকে সত্যি প্রমাণিত করে হুহু করে জ্বলে উঠলো আগুন, ড্রাইভার যুবকটি ব্যাটারি সংলগ্ন তারটি টানাটানি করে ছেঁড়ার চেষ্টা করেও পারলেন না। এর মধ্যে পথের দু'মুখে অনেকগুলো গাড়ি থেমে পড়েছে। তার মধ্যে একটা বাস এবং তাদের সবগুলির ড্রাইভার এক যোগে নানা রকম বিপরীত পরামর্শ দিতে লাগলো ও লাগলেন, ব্যাটারির তারটা টেনে ছেঁড়ার সাধ্য হলো না কারুরই।

স্ত্রী জাতি সহজেই উদ্বিগ্ন হয়, আর এখানে তো

যথেষ্ট কারণই রয়েছে। স্বাতী শুকনো মুখে বললো, যাঃ! অর্থাৎ আমাদের আর যাওয়া হবে না।

আমি তাকালুম কল্যাণের দিকে। পায়জামা ও পাঞ্জাবি পরা কল্যাণ একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে নির্লিপ্ত মুখে। সে যেন একজন পথের দর্শক, অন্য কারুর গাড়িতে আগুন লেগেছে, সে দেখছে। বেশ সুস্থিরভাবে পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বার করে একটি ধরালো। পায়জামা, পাঞ্জাবিতে কল্যাণকে বেশ নিরীহ দেখায়, প্যান্ট শার্টে তার দৃঢ়-চওড়া চেহারাটা বেশ পরিষ্কার হয়। তখন তাকে মনে হয় বহুযুদ্ধে পোড় খাওয়া একজন সৈনিক।

তার পোড়ার পট পট শব্দ হচ্ছে, আমার ধারণা এক্ষুনি এই পুরো জিপ গাড়িটি দাউ দাউ করে জ্বলবে, মালপত্রগুলো অন্তত নামিয়ে ফেলা যায় কি না ভাবছি, এই সময় একজন ড্রাইভার একটা ছোট হাত-করাত এনে ব্যাটারির তার কেটে দিতেই আগুনের মূল প্রতাপটা কমে গেল। তারপর জ্বলন্ত তারগুলোকে নেভাবার চেষ্টা।

কল্যাণ রাস্তার পাশে মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই বললো, দেখেছেন সুনীলদা, এই সময় মাঠ ধানে ভরে যাবার কথা,

কিন্তু এবার এখনো ভালো করে বৃষ্টিই হলো না—

আমি জিজ্ঞেস করলুম, গাড়িটার কি হবে? কল্যাণ বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো ও ঠিক হয়ে যাবে।

আমি দেখতে পাচ্ছি, গাড়ির বনেটের নিচে যে তারের জঙ্গল থাকে তা অধিকাংশই পুড়ে কালো কালো, এই অবস্থায় গাড়ি চলার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। তবু কল্যাণের কথায় অবিশ্বাস করতে পারি না।

সেই কবে ছেলেবেলায় পড়েছিলুম রেমার্কের 'অল কোয়ায়েট অন দা ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট', তার একটি চরিত্র কাটসিনস্কির কথা মনে পড়ে। যে কোনো পরিবেশের মধ্যে এই ধরনের মানুষ একটুও ঘাবড়ায় না। সব সময় কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলতে পারে, সব ঠিক হয়ে যাবে! কল্যাণ কথা বলে খুব কম, অনেক কথায় উত্তর দেয় শুধু হেসে। ঝাড়গ্রামে ওকে বলেছিলুম, কল্যাণ, অনেকবার তো এদিকে এলুম, কাঁকড়াঝোড়টা একবারও দেখা হলো না, স্বাতীরও খুব যাওয়ার ইচ্ছে, একটা জিপ-টিপ জোগাড় করা যাবে? 'উইদাউট ব্যাটিং অ্যান আইলিড' যাকে বলে, কল্যাণ বলেছিল, হ্যাঁ, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি ভেবেছিলুম কিছুক্ষণ

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে এ বিষয়ে, কিন্তু কল্যাণ সংক্ষিপ্ততম বাক্যে জানালো, কাল সকাল দশটা-এগারোটায় বেরিয়ে পড়বো।

ঝাড়গ্রামে এসেছিলুম রাধানাথ মণ্ডলদের গল্প চক্রেব অধিবেশনে। সন্তোষকুমাব ঘোষ মধ্যমণি। এক সন্ধ্যের ব্যাপার। পবদিন সকালে সন্তোষদা সদলবলে ফিরে গেলেন কলকাতায়, বাংলোয় শুধু স্বাতী আর আমি। এগারোটা বেজে গেল, কল্যাণেব পাত্তা নেই। স্বাতী কল্যাণকে আগে দু'একবাব মাত্র দেখেছে, সুতরাং সে একটু উতলা হয়ে উঠতেই পাবে। সাজ পোষাক করে, জিনিস পত্র গুছিয়ে আমরা তৈরি। এখন যদি কল্যাণ এসে বলে, জিপ পাওয়া গেল না—এই ধবনের চিন্তা।

সাড়ে এগারোটায় কল্যাণ এলো, শুধু জিপ নিয়ে নয়। সেই সঙ্গে চাল-ডাল তেল-নুন-আলু-লঙ্কা-পেঁয়াজ-পাউরুটি-ডিম-মুর্গী ইত্যাদি যাবতীয় বাজার করে। কাঁকড়াঝোড়ে কিছু পাওয়া যায় না। এসব কথা কল্যাণ আমাকে একবারও বলেনি। জিপ থেকে নেমে শুধু বলেছিল, কাছেই ফরেস্ট অফিস আপনি ডি-এফ-ও'র সঙ্গে একটু কথা বলে বাংলো-টার বুকিং করে নিন্। গেলুম ডি-এফ-ও'র কাছে। ইনি, শ্রীসুবিমল রায় আমাদের বন্ধু পার্থসারথি

চৌধুরীর সহপাঠী, তা ছাড়া কাঁকড়াঝোড়ে বেশী লোক যায় না, সুতরাং বাংলো রিজার্ভেশানের ব্যাপারে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। সমস্যা যে কিছু হবে না, সবই যেন কল্যাণের আগে থেকে জানা।

ড্রাইভার যুবকটি পোড়া তারগুলো টেনে টেনে বার করছেন, অন্যান্য ড্রাইভাররা উপদেশের ঝড় বইয়ে দিচ্ছে, আমার মনে হলো, এই অবস্থায় এই গাড়িকে টেনে নিয়ে যাওয়াই একটা সমস্যা হবে, আমাদের যাওয়া তো দূরের কথা।

কল্যাণ বললো, ঐ জন্যই তো ড্রাইভার আনি নি।

আমি বললুম, তার মানে ?

—যার কাছ থেকে জিপটা এনেছি, তার দুটো জিপ। ভালো, নতুন জিপটা নবগ্রামে চলে গেছে, সেটা পেলে ভালো হতো। এটাতেও কাজ চলে যায়।

—কিন্তু এখন কী হবে ?

—সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখুন না।

আমাদের জিপ চালক অন্যান্য ড্রাইভারদের কারুর কাছ থেকে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার, কারুর কাছ থেকে প্লাস ইত্যাদি ধার চেয়ে চলেছেন, তারপর শুধু একটা লম্বা তার দিয়ে কিসের সঙ্গে কী জুড়ে দিতেই গাড়ির ইঞ্জিন আবার গ-র-র গ-র করে

উঠলো। আমি হতবাক। এতগুলো বড়ো তারের বদলে মাত্র একটি তার?
কল্যাণ বললো। ঐ জন্যই তো ড্রাইভার আনিনি। রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে ড্রাইভাররা কিছু করতে পারে না। এ একজন মেকানিক। গাড়ির মিস্ত্রি। গ্যারাজে কাজ করছিল, জোর করে তুলে নিয়ে এসেছি।
অর্থাৎ সেইজন্যই কল্যাণের আসতে আধ ঘণ্টা দেরি হয়েছিল।
সত্যিই আবার দিব্য জিপটি চলতে শুরু করলো। দহিজুড়ি ছাড়বার কিছু পরেই তরুণ শালের জঙ্গল শুরু হয়। এ রাস্তা আমার বেশ চেনা। এ পথ দিয়ে অনেকবার বেলপাহাড়ীতে এসেছি।

আমরা বেলপাহাড়ীতে এসে পৌঁছোলাম বিকেলের দিকে। গাড়িকে একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকার। আমরা নেমে পড়লুম কল্যাণের চেনা একজন লোকের বাড়িতে। জিপ-চালক আবার বনেট উঁচু করলেন। এবার ব্যাটারির সঙ্গে তারটি লাগানো হয়েছে খুব আলগা ভাবে, যাতে আবার কোনো গণ্ডগোল হলে একটানে খুলে ফেলা যায়।

যাঁর বাড়িতে নেমেছি, তিনি জাতিতে সিন্ধি, চমৎকার

মেদিনীপুরের টানে বাংলা বলেন, ইনি একজন বিড়ি পাতা ব্যবসায়ী। লক্ষপতি বললে খুব কম বলা হবে, অর্ধকোটিপতি বলাই বোধহয় সঙ্গত। এঁর বাড়িটির ছাদ টিনের, পেছন দিকে দু' আড়াই শো মজুর-মজুরনী কাজ করছে। কল্যাণ নিজেও বিড়ি পাতার ব্যবসায়ে নেমেছিল, বেশ কিছু টাকা লোকসান দিয়ে পিছু হটে এসেছে। বিড়ি পাতা ব্যবসায়ে যেমন ঝুঁকি, তেমনি লাভ, এরকম জানা গেল, এ অঞ্চলে সিন্ত্রিরাই একচেটিয়াভাবে এ ব্যবসা করেছে এতদিন। সরকার আদিবাসী উন্নয়ন সমিতির হাতে বিড়ি পাতার জঙ্গলের ইজারা দিতে চান, কিন্তু যা হয়, সিন্ত্রি ব্যবসায়ীদের দক্ষতার তুলনায় কেউ কিছু না। সরকারী উদ্যোগে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশী হয় প্রতি বছর।

চকচকে কাঁসার গেলাসে জল এবং পরে সর-ভাসা বেশী দুধের চা খেয়ে আমরা আবার যাত্রা শুরু করলুম। বেলপাহাড়ী জায়গাটি সমতল ও পাহাড়ী এলাকার ঠিক সংযোগ স্থলে। যতবার আসি, দেখি যে, বেলপাহাড়ীতে মানুষ ও বাড়ির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। সারা পৃথিবীতেই মানুষ বাড়ছে তো বেল-পাহাড়ীতেই বাড়বে না কেন?

পাহাড় জঙ্গলে ঢোকবার মুখে একজন ফরেস্ট গার্ডকে সঙ্গে নিয়ে নিলুম। কারণ, ঝাড়গ্রামেই ডি এফ ও

বলেছিলেন, কাঁকড়াঝোড়ে কয়েকদিন ধরে এক পাল হাতি দেখা যাচ্ছে। প্রতি বছরই ওরা আসে, তবে এবার যেন একটু আগে এসেছে। উত্তর বাংলার হাতিদের মতন এখানকার হাতি তেমন হিংস্র নয়, তবে একেবারে সামনাসামনি পড়ে গেলে দুষ্টুমি করে জিপটা উল্টে দিতেও পারে।

ফরেস্ট গার্ডটির শুকনো ক্ষয়াটে চেহারা। এমনই রোগা যে ওর কোমরের বেল্টে নিশ্চয়ই নতুন ফুটো করতে হয়েছে। হাতে একটা লাঠি, হাতি সামনে এসে পড়লে এই ব্যক্তি কীভাবে আমাদের সামলাবে?

কল্যাণ বললো, জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা হারিয়ে ফেলার খুব ভয়। এ অন্তত রাস্তা চিনবে।

এ কথায় আমাদের জীপ চালক জানালেন, আমি কাঁকড়াঝোড় সাত আটবার এসেছি, রাস্তা আমার মুখস্থ।

পাকা রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকে জঙ্গলের মধ্যে পাথুরে রাস্তায় ঢুকতেই বুঝতে পারলুম, কেন, কাঁকড়াঝোড়ে বেশী লোক আসে না। কলকাতা থেকে কতই বা দূর, দুশো-আড়াইশো মাইলের মধ্যে। আজকাল কয়েকটি বেশ স্মার্ট ট্রেন চলে, তাতে আড়াই বা তিন ঘণ্টায় পৌঁছোনো যায় ঝাড়গ্রাম। সেখান থেকে মজবুত জিপ পেলে আর তিন ঘণ্টার মধ্যে কাঁকড়া-

ঝোড়। এবং পথ চেনার জন্যও সঙ্গে কারুর থাকা দরকার, কেননা, বনের মধ্যে দিয়ে চোদ্দ কিলোমিটার যেতে যেতে অনেক শাল পথ, তার যে-কোনো একটি ধরে হারিয়ে যাওয়া খুব সোজা।
এ রাস্তা বিপজ্জনক নয়, দুর্গম। প্রায়ই বড় বড় চড়াই-উৎরাই, মাঝে মাঝে গর্ত। এক একবার কোনো গর্তে পড়ে গাড়িটি লাফিয়ে উঠলেই আমি ভাবি, ব্যাটারির তারটা ছিঁড়ে গেল না তো?

স্বাতী ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। যদি হাতি দেখতে পাওয়া যায়। একটু দূরে যে-কোনো গাছপালার জটলার দিকে তাকালেই যেন মনে হয়, ওখানে কোনো হাতি ঘাপটি মেরে আছে। কল্যাণের ধারণা পথে হাতি পড়বেই, কারণ সে এদিকে আগে হাতি দেখেছে নিজের চোখে। এক জায়গায় হাতির 'গোবর' পড়ে থাকতে দেখে কল্যাণ বললো, ঐ যে এই রাস্তা দিয়েই গেছে। আমি অভিজ্ঞ শিকারীর ভাব নিয়ে ওকে জানালুম যে, ওটা অন্তত দু'দিনের পুরোনো।
কল্যাণের মতে, এই জঙ্গলে বাঘ নেই বটে, কিন্তু নেকড়ে আছে। ডি-এফ-ও'-ও আমায় বলেছিলেন, জঙ্গলের মধ্যে জিপের পেছনে পেছনে কখনো কখনো নাকি কুকুরের মতন কোনো প্রাণীকে ঘাড় নিচু করে

ছুটে আসতে দেখা গেছে। যদিও নেকড়ে আজকাল খুবই দুর্লভ। জঙ্গলের নেকড়েগুলোই এখন অ্যালসেশিয়ান হয়ে শহরের অনেক বাড়িতে শোভা পায়।

হাতি কিংবা নেকড়ে কিছুরই দর্শন লাভ ঘটলো না। আমরা বাংলোর কাছে এসে পৌঁছোলাম বিকেলের ব্রাহ্ম মুহূর্তে। জিপ থেকে নেমেই বললুম, বা!

বাংলোটি এমনই জায়গায়, যেখান গোল হয়ে ঘুরে তাকালে দেখা যাবে শুধু জঙ্গল-মাখা পাহাড়। এখানে দাঁড়ালে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় যে আমরা চলে এসেছি পৃথিবীর এক প্রান্ত সীমায়, সভ্যতা থেকে অনেক দূরে। যদিও দুপুরবেলাতেই আমরা একটা শহরে ছিলাম।

শেষ বিকেলের রক্তাক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে বাংলোটি আমাদের মন কেড়ে নেয়। তা বলে এমন নয় যে এর থেকে ভালো বাংলো আমরা আগে কখনো দেখিনি। বস্তুত, ফরেস্ট বাংলোগুলির চেহারা একই রকম হয় প্রায়। তবু এক একটি সময় আসে, যখন সুন্দরের মধ্যে কোনো তুলনার কথা মনে আসে না, চোখের সামনের বস্তুটিকেই মনে হয় পরম প্রাপ্তি। বড় বড় শাল গাছের মধ্যে একটি কাজু বাদাম গাছ দেখে স্বাতী মুগ্ধ। ও আগে

কখনো ঐ গাছ দেখেনি।

কল্যাণ জিজ্ঞেস করলো, আপনি চন্দন গাছ দেখেছেন ?

স্বাতী তা-ও দেখেনি। কল্যাণ সংক্ষেপে জানালো, কাল সকালে আপনাকে দেখাবো !

দেখতে না দেখতেই ঝুপ ঝুপ করে অন্ধকার নেমে এলো। আমরা বাংলোর মধ্যে ঢুকে ব্যাপৃত ছিলাম পোষাক পরিবর্তনে। এবং অল্প ক্ষণের মধ্যেই কল্যাণ জানালো যে চা, ডিম সেদ্ধ ইত্যাদি তৈরি।

বাংলোর বারান্দায় বসে দ্বিতীয় কাপ চা খাচ্ছি, এমন সময় একজন লোক দু' বোতল মহুয়া এনে রাখলো কল্যাণের পায়ের কাছে। কল্যাণ বোতল দুটি তুলে প্রথমে টোকা দিয়ে টং টং শব্দ শুনলো, তারপর ছিপি খুলে দু' তিনবাব ঘ্রাণ নিয়ে বললো, হ্যাঁ, খাঁটি জিনিস। আমি হাসলুম।

*

কল্যাণের ব্যবস্থাব কোনো ত্রুটি নেই। শালের জঙ্গলে এসেছি, মহুয়া তো পান করবোই। আমরা পৌঁছানো মাত্রই কল্যাণ ঠিক মনে করে মহুয়া আনতে পাঠিয়েছে। কিন্তু হাসলুম এই জন্য যে, সময়ের কত বিচিত্র রকম খেয়াল! কল্যাণকে আগে যতবার দেখেছি, ওর দুরন্তপনায় হতবাক হয়ে গেছি,

ওর শরীরে ও মনে অসাধারণ শক্তি, এক বোতল মহুয়া ও এক চুমুকে শেষ করে দিতে পারে। সারা রাত জেগে তাশ খেলে, সকালবেলা একটুও না ঘুমিয়ে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়ে, যখন যে জিনিসটি চায় সেটা পেতেই হবে···। সেই কল্যাণ যেন ধীর, শান্ত এবং কিছুদিন আগে তীব্র শ্বাসকষ্টের অসুখ হওয়ায় ও আগামী ন' মাস এক বিন্দুও অ্যালকোহল পান করবে না। ঠিক ন' মাস কেন, তা অবশ্য রহস্যময়।

নিজেই একটি গেলাসে খানিকটা মহুয়া ঢেলে কল্যাণ বললো, আগে একটু টেস্ট করে দেখুন, সুনীলদা। বৌদিও একটু চোখে দেখবেন নাকি? দেখুন না খাঁটি মহুয়ার মতন এমন ভালো জিনিস···

নিজে পান না করলেও অপরকে পান করাবার ব্যাপারে কল্যাণের উৎসাহ একই রকম আছে। একটু পরে সে মাংস রান্নাব ব্যাপারে চৌকিদারকে নির্দেশ দেবার জন্য উঠে চলে গেল।

জঙ্গলটা ডুবে আছে অরব অন্ধকারে। সৌভাগ্যের কথা, আকাশ খুব পরিষ্কার। এত বেশী তারা একসঙ্গে দেখবার জন্যই মাঝে মাঝে অরণ্যে আসা দরকার। আকাশ তার এমন রূপ আর অন্য কোথাও দেখায় না। ওপরের দিকে তাকিয়ে

থাকলে মাঝে মাঝে নক্ষত্র পতন দেখা যায়। নক্ষত্র কিংবা উল্কা, পরিষ্কার চোখে পড়ে, একটা আলোর বিন্দু আকাশ থেকে খসে পড়তে পড়তে, যেন আকাশের খুব কাছাকাছি এক দীর্ঘকায় শাল গাছের মাথার কাছে এসে নিভে গেল।

কল্যাণ মাংস রান্নার ফাঁকে ফাঁকে আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিচ্ছে। একবার সে বললো, বৌদি ঐ যে দেখুন! ওটা কিন্তু তারা নয়!

আমরা আকাশে দিকে তাকিয়ে দেখলুম, একটা আলোর বিন্দু আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যাচ্ছে, নিচে খসে পড়ছে। সত্যিই সেটা তারা নয়, বিমানও নয়, সেটা কোনো রকেট নিশ্চিত। অসংখ্য রকেট তো এখন আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে খালি চোখে তারই একটাকে দেখতে পেয়ে আমরা বেশ রোমাঞ্চিত বোধ করি।

জঙ্গল আর অরব রইলো না, একটু পরে দূরে, বহু দূরে শোনা গেল দ্রিদিম দ্রিদিম শব্দ। মাদল কিংবা খোল। কিন্তু এমনই আধোজাগা, গম্ভীর সেই শব্দ যে রীতিমতন রহস্যময় মনে হয়। যেন আদিম কালের পৃথিবীতে কেউ কারুর কাছে কোনো সঙ্কেত পাঠাচ্ছে। আমরা চুপ করে শুনি।

নৈশ ভোজের পর আমরা অন্ধকারের মধ্যে একটু হাঁটতে বেরোলুম। স্বাতী একবার খুব মৃদু ভাবে

জিজ্ঞেস করলো, এখানে সাপ আছে ? কল্যাণ বললো, তা তো থাকতে পারেই !
এবং হাতির দলও কাছাকাছি কোথায় রয়েছে
সুতরাং রাত্রে বেশী দূর অ্যাডভেঞ্চার করা যায় না।
এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে, এক দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে কল্যাণ বললো, ঐখানে আলো দেখতে পাচ্ছেন ?
চোখ সরু করে আমরা দেখলুম, জঙ্গলের ফাঁকে, বোধহয় দুই পাহাড়ের মাঝ দিয়ে, একটা আলোর রেখা, অনেক দূরের।
কল্যাণ বললো, ঐ দিকে ঘাটশীলা। কপার মাইনসের আলো।
অর্থাৎ ঘাটশীলায় গিয়ে আমরা দূরে যে পাহাড়ের রেখা দেখি সেই পাহাড়েরই কোনো চূড়ায় আমরা রয়েছি। ঘাটশীলায় কতবার গেছি, কখনো ভাবিনি, দূরের ঐ পাহাড়গুলোতে কখনো থাকবো। চাঁদে যাবার পর কেউ যদি আঙ্গুল দেখিয়ে বলে, ঐ ছাখো, দূরে পৃথিবীর আলো—অনেকটা সেই রকম বোধহয়। সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। পাহাড়ের অন্য দিকে কোথাও তখনও দ্রিদিম দ্রিদিম শব্দ সেই গম্ভীর, রহস্যময় মাদলের শব্দ। বোধহয় সারারাতই সেই শব্দ শুনেছিলাম।
অরণ্যে দিন ও রাত্রি সত্যিই আলাদা! সকাল

বেলা অনেক কিছুই আর রহস্যময় বা রোমাঞ্চকর থাকে না। ভারতবর্ষে বোধহয় এমন অরণ্য একটিও নেই, যা সম্পূর্ণ নির্জন। দিনেরবেলা আমি সব জঙ্গলেই মানুষের যাতায়াত দেখেছি। শুধু যাতায়াত নয়, বসতিও।

সন্ধের পর আমরা এই বাংলোটিকে যত নিরিবিলি ভেবেছিলুম, সকালে উঠে দেখা গেল, আসলে ততটা নয়। বাংলোটি টিলার ওপরে, একটু নেমে গেলেই বেশ কিছু কোয়ার্টার, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের। এবং জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে কয়েকটি গ্রামও রয়েছে। কয়েক জায়গায় চাষ আবাদও হয়। প্রকৃতির শোভা দেখলেই তো চলবে না, মানুষকে তো বাঁচতেও হবে!

সকালের প্রথম চা আমরা পান করলুম বাংলোর পেছন দিকে একটা বেশ উঁচু মিনারের মতন জায়গায়। এখান থেকে পাহাড়ের গোল মালাটি স্পষ্ট দেখা যায়। অরণ্য সবুজ, কিন্তু সবুজ মোটেই একটা রং নয়, অন্তত সাত রকম সবুজ তো এই এখানেই রয়েছে।

কল্যাণ খুব সন্তর্পণে একটি ঘাস ফুলকে আদর করে। তারপর একটি শাল গাছের গা থেকে খানিকটা আঠা ভেঙে এনে স্বাতীকে বলে, জানেন, এর থেকেই ধূপধুনোর ধুনো তৈরি হয়?

স্বাতী জানতো না, এই সম্পূর্ণ নতুন তথ্যে ও অবাক হয়ে বললো, ওমা, তাই নাকি ?

আমাদের তুলনায় স্বাতীই সবচেয়ে কম বার বন জঙ্গলে এসেছে। ও শাল ও সেগুন গাছের তফাৎ জানে না। ও জানতো না যে কুসুম গাছ বলে কোনো গাছ থাকতে পারে, যার ফলের নাম কুসুম ফল, এবং লোকে তাই খায়। কচি অবস্থায় যে গাছের পাতা থেকে হয় বিড়ির পাতা। সেই গাছই বেশ বড় মোটা, আর কালো হয়, তার নাম কেন্দু, তখন তার পাতা কোনো কাজে লাগে না, কিন্তু কেন্দু ফল জঙ্গলের লোকদের খাদ্য। আমাদের তুলনায় স্বাতীর বিস্ময়বোধ অনেক টাটকা বলে, এই জঙ্গলকে ও উপভোগ করছে বেশী।

কল্যাণ আমার একটা অচেনা গাছের পাতা ছিঁড়ে বললো, দেখুন, কী সুন্দর শেপ, শিরাগুলো কেমন চমৎকার ভাবে ছড়িয়ে গেছে—।

প্রতি বছর জঙ্গলের কিছু অংশ ইজারা নিয়ে গাছ কাটা কল্যাণের পেশা। কিন্তু ও গাছকে ভালো বেসে ফেলেছে। প্রতিটি গাছ ওর চেনা, ও জানে, কোন্ কোন্ গাছ কাটতে নেই, হঠাৎ হঠাৎ এক একটা গাছের দিকে তাকিয়ে ও বলে, দেখুন দেখুন, কী সুন্দর।

কল্যাণের এই পরিচয় আমি আগে জানতুম না। আগে প্রত্যেকবার দেখেছি এক দুরন্ত কল্যাণকে। সেই দুর্দান্তপনা এবং অনর্গল নেশা করার স্বভাব ত্যাগ করেছে বলে অন্য অনেকদিকে ওর মন খুলে গেছে। ও খালি চোখে আকাশের রকেট দেখতে পায়, দারুণ মুর্গীর মাংস রান্না করে, গাছের পাতার গড়নে মুগ্ধ হয় এবং আদিবাসীদের জীবন নিয়ে চিন্তা করে। এখন ওর হাতে অনেক সময়।

জঙ্গলে এলে সবচেয়ে ভালো লাগে এইটাই যে কিছুই করবার থাকে না। যতক্ষণ ইচ্ছে চুপচাপ বসে থাকা যায়, অথবা ইচ্ছে করলে যে-দিকে খুশী ঘুরে বেড়ানোও যায়। অলসভাবে সেখানে অনেক ক্ষণ কাটিয়ে তারপর আমরা বেরিয়ে পড়লুম একটা মন্দির দেখবার উদ্দেশ্যে।

স্বাতীর খুব মন্দির দেখার শখ, বিশেষত যদি পুরোনো মন্দির হয়। কল্যাণ ইতিমধ্যেই এই মন্দির সম্পর্কে একটা রোমহর্ষক গল্প শুনিয়েছে। কাল ভৈরবের মন্দির, এককালে নাকি ওখানে নিয়মিত মানুষ বলি হতো, এখনো মাঝে মধ্যে হয় লুকিয়ে চুরিয়ে। মন্দিরের ঠিক মাঝখানে গর্তের মধ্যে একটা বিরাট সাপ আছে, বলির রক্ত সেই সাপটা এসে চুক চুক করে খেয়ে যায়।

বাংলো থেকে বেরিয়ে আমরা প্রথমে চন্দন গাছ

দর্শন করলাম। কিছুদূরে কমলালেবুর গাছও লাগানো হয়েছে। চন্দন গাছের পাতায় বা ডালে কোনো গন্ধ নেই, শুনলাম, ঐ গাছে সুগন্ধ আসতে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর লাগে। শিকড়ে একটু একটু গন্ধ পাওয়া যায়, তাই কারা যেন মাটি খুঁড়ে খানিকটা শিকড় কেটে নিয়ে গেছে।

এদিকে জঙ্গল অনেক পাতলা। পর পর দুটি মকাই-খেত। তারপর একটি লাল রঙের ঝর্ণা। হাঁটু জল সেই ঝর্ণা পেরিয়ে, একটা ছোট পাহাড় ডিঙ্গিয়ে আবার এলাম একটা সমতল মতন জায়গায়, যার পাশে একটি বেশ ছোট্ট খাট্টো খরস্রোতা নদী, আল্‌গা আল্‌গা ভাবে দাঁড়ানো কয়েকটি বহু পুরোনো বিশাল শাল তরু। তার মধ্যে একটি গাছের গায়ে হাত দিয়ে কল্যাণ বললো, এ গাছটার দাম কম করেও অন্তত দশ হাজার টাকা!

বিস্ময়ে আবার স্বাতীর ভুরু উঠে যায়। সান গ্লাস খুলে সে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভালোভাবে গাছটিকে দেখে।

কল্যাণ বললো, তবে এত বড় গাছ না-কাটাই উচিত।

এখানে মাঝে মাঝেই ছোট ছোট মাটির তৈরি হাতির মূর্তি ছড়ানো। মন্দিরের তীর্থযাত্রীরা মানত্ করে গেছে। বাঁকুড়ায় যেমন ঘোড়া,

এখানে সে রকম হাতি। তবে, মন্দিরটি আমাদের হতাশ করলো। কল্যাণকেও। আগে সে দেখে গিয়েছিল, খুব পুরোনো একটা মাটির ঘর, খড়ের ছাউনি—তাতে পুরোনো পুরোনো গন্ধ ছিল। এখন তার বদলে ইঁট-শুর্কি দিয়ে একটা বদখত্ চেহারার মন্দির বানানো হয়েছে।

জায়গাটি অবশ্য সম্পূর্ণ জনশূন্য। মন্দিরের পূজারী-টুজারীও কেউ নেই। মন্দিরের সামনে একটি কাঠগড়া, তাতে এখনো শুকনো রক্ত লেগে আছে। মানুষের রক্ত নিশ্চয়ই নয়। মোষ বলিরই চলন বেশী আদিবাসীদের মধ্যে। মোষের নাম এখানে কাড়া। কল্যাণের মুখে শুনলাম, এখানে কাড়া বলির পর মুণ্ডুটা পায় পূজারী, আর বাকি মাংস ভাগ-যোগ করার উপায় থাকে না। তার আগেই সব লোক ওটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে যে যতখানি পায় নিয়ে পালিয়ে যায়।

জায়গাটা বেশ পরিচ্ছন্ন, শান্ত ও আবিষ্ট ধরণের। আমরা তিনজনে তিনদিকে বসে রইলাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে কল্যাণ বললো, ভুল হয়ে গেল, একটা মহুয়ার বোতল সঙ্গে আনলে ভালো হতো। এটাও ওর নিজের জন্য নয়, আমার জন্য। ওর পূর্ব জীবনের স্মৃতি, এই রকম পরিবেশে একটু একটু মহুয়ায় চুমুক দিলে বেশ জমে।

কতক্ষণ বসে ছিলাম খেয়াল নেই। কথা বলারও প্রয়োজন হয় না। বড় বড় শাল গাছগুলো মাথার ওপব ছত্রছায়া বিছিয়ে রেখেছে। মাঝে মাঝে উড়ে যাচ্ছে টিয়া পাখির ঝাঁক। এই বনে পাখিদের মধ্যে টিয়াবই প্রাধান্য। মুনিয়া পাখির চেয়েও ছোট একটা পাখিব ঝাঁক দেখেছিলাম। আর দূবে কোথাও একটা কুবো ডেকে চলেছে।

সাপটাকে প্রথমে স্বাতীই দেখলো। জঙ্গলে আমাদের প্রথম সাপ। খানিকটা যেন অবিশ্বাসের সুরেই স্বাতী বললো, ওটা কী, সাপ না? আমরা থমকে তাকালুম।

সাপটা আমাদেব তিনজনেব মাঝখানে ফাঁকা জায়গাটায় কী করে কখন এলো বুঝতেই পারিনি। আমরা যেমন অবাক হয়েছি, সাপটাও তার চেয়ে কম অবাক হয়নি। কয়েক মুহূর্ত আমাদের দেখেই সে বিদ্যুতের মতন এঁকেবেঁকে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

কল্যাণ বললো, চন্দ্রবোড়া!

এটাই সেই মন্দিরের সাপ বলে বিশ্বাস করা যায় না। সাপটি বয়েসে বেশ তরুণ। বহুকাল ধরে এ বলির রক্ত পান করে যাচ্ছে, একথা মানতে পারি না, এর পিতৃ-পিতামহ কেউ এ কাজ করলেও করতে

পারে। সাপটা এখনো ঝোপের মধ্যেই রয়েছে, সুতরাং এর সংসর্গে আর বেশীক্ষণ থাকা উচিত নয়, শাস্ত্রের নিষেধ আছে।

ফেরার পথে কল্যাণ এক জায়গায় এসে দুঃখিত হলো। একটি মাঝ বয়েসী শাল গাছ পরাজিত যোদ্ধার মতন মাটিতে শুয়ে আছে। কোনো কাঠ-চোর এটিকে কেটেছে, সবটা নিয়ে যেতে পারেনি। ছেঁটে নিয়ে গেছে ডালগুলো। শুয়ে থাকা গাছ দেখলে আমারও কষ্ট হয়। বিশেষত, 'দা সিক্রেট লাইফ অব প্ল্যান্টস' বইটা পড়বার পর থেকে গাছ সম্পর্কে আমার ধারণা আমূল বদলে গেছে।

আর একটু এগোবার পর আমরা একটি উপহার পেলাম। একটি কাচ পোকা কিংবা টিপ পোকা। সমস্ত বন মাতিয়ে বোঁ বোঁ শব্দ করতে করতে উড়ে এসে সে আমাদের সামনেই একটা নিচু গাছে এসে বসলো এবং কল্যাণ অমনি খপ্ করে ধরে ফেললো সেটাকে। এত বড় টিপ পোকা আমি আগে কখনো দেখিনি। কী অপূর্ব সুন্দর তার রং, উজ্জ্বল নীল ও সোনালি। পাখিদের মধ্যে যেমন ময়ূর, পোকাদের মধ্যে তেমনি এই টিপ পোকাদের কেন যে এত রঙের সৌভাগ্য, তা কে জানে। মজা এই যে, পোকাটিকে ধরে কল্যাণ ওর বাঁ হাতের তালুতে উল্টো করে

শুইয়ে রাখতেই সে দিব্যি গুটি সুটি মেরে শুয়ে রইলো। যেন তাকে কেউ দেখছে না।

লাল রঙের ঝর্ণাটা পার হবার পর আমরা মাদলের শব্দ শুনতে পেলুম। কল্যাণ বললো, কাছেই একটা ছোট গ্রাম আছে, চলুন, সেদিক দিয়ে ঘুরে যাই।

গ্রাম মানে কী। আট দশটা কাঁচা বাড়ি। তারই একটা বাড়ির মধ্যে একজন লোক মাদল বাজাচ্ছে, আর একজন নাচছে, আর তাদের ঘিরে হাসছে অনেকে। বাজনদার বা নাচুনে, কারুরই শরীর নিজের বশে নেই, পা টলমল, মহুয়ার নেশায় একেবারে চুর চুর। কিন্তু বাজনা বা নাচের উৎসাহ ওদের একটুও কম নয়।

আমাদের খাতির করে একটা খাটিয়ায় বসতে দেওয়া হলো।

এই জঙ্গলে তিন জাতের মানুষ থাকে। লোধা বা শবর, তারা এখনো বাউণ্ডুলে, শিকার টিকার করে খায়, বা দিন মজুরির কাজ করে, চুরির দক্ষতার ব্যাপারেও তাদের সুনাম আছে, কিন্তু তারা চাষবাস জানে না। দ্বিতীয় দল সাঁওতালরা বেশ সুসভ্য, তারা শিকার ও চাষ দুটোই জানে এবং দুপুরবেলা মহুয়া খেয়ে নাচ-গান নিয়ে আনন্দ করতে জানে শুধু তারাও। আর

আছে মাহাতোর।, তারা অন্যদের তুলনায় কিছুটা সচ্ছল।

এ বাড়িটা যে সাঁওতালদের, তা দেখেই বোঝা যায়। লোকজনের পায়ে পায়ে ঘুরছে—কয়েকটি একেবারে সদ্যোজাত, একদিন বা দুদিন বয়েসী মুর্গীর ছানা। ওগুলোকে ঠিক চলন্ত কদম' ফুলের মতন দেখায়। একটু দূরে বাঁধা একটা ছাগলও নাচ দেখছে এক দৃষ্টে। স্বাতীর কাছে এ সবই নতুন। আগেকার দিন হলে আমিও মহুয়া খেয়ে ওদের সঙ্গে নাচে যোগ দিতাম। স্বাতী সঙ্গে রয়েছে বলেই শান্ত, সুশীল হয়ে বসে রইলুম। কল্যাণ আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে।

দরজার কাছে দাঁড়ানো একজন মাঝ বয়েসী রমণী মাঝে মাঝে নাচ চাঙ্গা করবার জন্য একটা গান ধরেছে। বেশ গলাটি। গানের ভাষা কিন্তু একেবারেই দুর্বোধ্য নয়, পুরোপুরি বাংলা, পথের মাঝে বৃষ্টি আসিল, বন্ধু আমার বান্ধা পড়িল—এই ধরনের। যে নাচছে এবং যে ঢোল বাজাচ্ছে, এই দুজনের মধ্যে কেউ একজন ঐ মহিলাটির স্বামী, ঠিক কোনজন তা বুঝতে পারলুম না, বাজনার তালে ভুল হলে কিংবা নাচুনেটি বেশী ঢলে পড়লে সে বকছে দুজনকেই। নাচুনেটির স্বাস্থ্য চমৎকার, চকচকে কালো শরীরটি ঘামে ভেজা, এত নেশাগ্রস্ত অবস্থাতে

সে কিন্তু একবারও মাটিতে পড়ে যাচ্ছে না। সে যেন আজ সারাদিন ধরে নাচবার জন্য বদ্ধপরিকর।

মহিলাটির গানের প্রতি আমি একবার তারিফ জানাতেই সে অপ্রত্যাশিতভাবে বললো, বাবু, আমার ন'খানা ছেলেমেয়ে। অর্থাৎ সে যেন জানাতে চায় যে নটি সন্তানের জননী হওয়া সত্ত্বেও সে গান গাইতে পারে। এটা একটা জানাবার মতন কথাই বটে।

আমি একটু কৌতুক করে বললুম, পুরোপুরি দশটা হলেই তো ভালো হতো!

তার উত্তরে সে উদাসীন গলায় বললো, হয়ে যাবে। দশটাও হয়ে যাবে। এই তো আমাদের একমাত্র সুখ!

স্বাতী আমার দিকে চেয়ে ভ্রূভঙ্গি করলো। প্রায় ঘণ্টাখানেক নাচ দেখার পর আমরা উঠে পড়লুম। একটু দূরে এসেছি, তখন দেখি পেছনে পেছনে সেই মহিলাটিও আসছে। অযাচিতভাবেই সে বললো, ওটা আমার বাড়ি নয়, আমার বাড়ি ঐ সামনে। আমার বাড়ি দেখবে না?

বিশেষত সে স্বাতীকে বললো, ও মেয়ে, তুমি আমার বাড়ি দেখবে না?

গেলুম তার বাড়িতে। এর বাড়ির উঠোনটিও অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে নিকোনো। এক পাশের

চালাঘরে একটি ঢেঁকি, তার পাশের খাটিয়ার বসলুম আমরা। মহিলাটি কথা বলতে ভালোবাসে। আমাদের সব বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস করে জানবার পর সে বললো যে তার বড় মেয়ে অনেকদিন পর বাপের বাড়িতে এসেছে বলে সেই আনন্দের চোটে তার মেয়ের বাপ মহুয়া খেয়ে নাচতে গেছে। ব্যাপারটা যেন অত্যন্ত কৌতুকের, এইভাবে সে হাসতে লাগলো খিল খিল করে।

তিন গেলাস কূয়োর জল খেয়ে আমরা উঠে পড়তে যাচ্ছি, তখন মহিলাটি অত্যন্ত বিস্মিতভাবে বললো, এ কি, তোমরা চলে যাচ্ছো ? খেয়ে যাবে না, আমি যে ভাত চাপাচ্ছি ?

আমরাও হতভম্ব। এদের দারিদ্রের প্রকৃত স্বরূপ বোঝা আমাদের পক্ষে সত্যিই বুঝি অসম্ভব। অচেনা কোনো মানুষ বাড়িতে এলে আমরা কোনোদিনই তাকে খেয়ে যেতে বলতে পারবো না।

রমণীটি আবার দুঃখিতভাবে বললো, আমার বাড়িতে এসে তোমরা না খেয়ে চলে যাবে ?

আমরা অত্যন্ত অপরাধীর মতন, বিনীত ভাবে বললুম আজ নয়, আর একদিন আসবো, নিশ্চয়ই এসে খেয়ে যাবো।

সে অবিশ্বাসের সুরে বললো, হ্যাঁ, আর এসেছো।

সারা বছর ভাত খাওয়া ওদের কাছে বিলাসিতা। মন্দির থেকে ফেরার পথে একজন স্ত্রীলোককে দেখেছিলাম, তার কাঁখালে একটি রোগা শিশু। মাথায় এক বোঝা শুকনো ডালপালা আর হাতে ছুটি সবুজ পাতায় মোড়া কী যেন। সে স্ত্রীলোকটি বাংলা বুঝতে পারে না, কল্যাণ তার সঙ্গে আদিবাসীদের ভাষায় কথা বলে ঠোঙা ছুটি দেখতে চাইলো। তাতে আছে কিছু থেঁৎলানো বুনো জাম আর কিছু ব্যাঙের ছাতার মতন জিনিস। কল্যাণ আমাদের বলেছিল, ঐগুলোই ঐ মা-ছেলের সারাদিনের খাদ্য। এই জঙ্গলের অনেকে মাটি খুঁজে খুঁজে এক ধরনের বুনো আলু পায়, তাই খেয়েই দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয়। অনেকে শাল গাছের ডগার কচি পাতাও সেদ্ধ করে খেয়ে নেয়। আর ঐ স্ত্রীলোকটি আমাদের তিনজনকে অকারণে ভাত খেয়ে যেতে বলছিল। হয়তো, কিছু বিক্রি করে হাতে কিছু ধান এসেছে।

বাংলোয় ফিরে এসে আমরা খানিকক্ষণ চুপ করে বসলুম। এখান থেকে সেইসব বাড়িঘর কিছুই দেখা যায় না। শুধু দিগন্ত ছোঁয়া জঙ্গল আর পাহাড়। চোখকে আরাম দেওয়া প্রকৃতি। এরই মধ্যে মধ্যে রয়ে গেছে ক্ষুধার্ত মানুষ, আবার ছুপুরবেলা নেশা করে নাচবার মতন মানুষ, অতিথি সেবার জন্য ব্যাকুল

মানুষ। কয়েকটি ক্ষুধার্ত, অসহিষ্ণু হাতিও ঘুরছে কাছাকাছি।

কল্যাণ টিপ পোকাটাকে পাতায় মুড়ে লতা দিয়ে বেঁধে একটা প্যাকেট বানিয়ে নিয়েছিল। সেই প্যাকেটটা বারান্দার ওপর রাখতেই পাতার একটু অংশ কেটে টিপ পোকাটি মুখ বার করলো। বেশ কৌতূহলী চোখ দিয়ে দেখতে লাগলো আমাদের।

স্বাতী বললো, ওটাকে ছেড়ে দিন। পোকাটাকে মেরে টিপ পরবার ইচ্ছে আমার নেই।

কল্যাণেরও সেই রকমই ইচ্ছে। পাতাটা খুলে সে পোকাটাকে হাতে করে উড়িয়ে দিল।

টিপ পোকাটা বোঁ শব্দ করে দু'পাক ঘুরলো, আমাদের মাথার ওপরে, তারপর দুর্দান্ত গতিতে মিলিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

আমি হাসতে হাসতে বললুম, যদি বলি, আমার বুকে বাঘের পায়ের ছাপ আছে, কেউ বিশ্বাস করবেন ?

সত্যিই কেউ বিশ্বাস করলো না, সবাই এমন ভাবে চক্ষু অবনত করলো যেন এই নিস্তব্ধ, নিমীল সন্ধ্যায় আমি কোনো অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি। এখানে এসব কথা মানায় না।

আমি আবার বললুম, সত্যিই বলছি কিন্তু, ইয়ার্কি নয়। একবার একটা বাঘ দু'পা তুলে দাঁড়িয়েছিল আমার বুকে।

এবার শ্রোতারা চক্ষু তুললো। চোদ্দ-পনেরো বছর বয়স্ক কিশোর মাঝিটি জিজ্ঞেস করলো, সার্কেসের বাঘ, বাবু ?

কথা হচ্ছিল সুন্দরবন অঞ্চলে এক বিশাল চওড়া নদী বক্ষে একটি খোলা নৌকোর ওপর। বেরিয়ে-ছিলুম সারাদিনের মনে, এই নৌকোর ওপরেই খিচুরি ভোগ হলো, রান্না করলুম নিজেরাই। আর এমন খিচুড়ি জীবনে খাইনি, কী অমৃতের মতন স্বাদ।

আমার সঙ্গে আমার এক কলকাতার বন্ধু, তার এ স্থানীয় বন্ধু, একজন স্কুল শিক্ষক। আমি ছাড়া বাকি এই তিনজনেরই সুন্দরবনের সঙ্গে সংযোগ দীর্ঘদিনের, এই অঞ্চলের অনেক কিছুর খবরাখবব রাখেন। মাঝিদের মধ্যে একজনের বয়েস তিরিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে যে কোনো জায়গায়, রোদ-বৃষ্টিতে পোড়া-ভেজা লোহার মতন গড়া-পেটা শরীর, মুখে অনেক অভিজ্ঞতার ছাপ। আর একজন ঐ পূর্বোক্ত কিশোর।

সুন্দরবনে এলেই বাঘের কথা মনে পড়ে। এর আগে কয়েকবার লঞ্চে চড়ে সুন্দরবন ঘুরে গেছি, কিন্তু সে শুধু প্রকৃতি দেখা। এবারে এসে আশ্রয় নিয়েছি একটি গ্রামে। যার পাশের গ্রামেই একটি ছটকে আসা বাঘ ধরা পড়েছে কিছুদিন আগে। সে বাঘটিকে রাখা হয়েছে কলকাতার চিড়িয়াখানায়, তার নাম দয়ারাম। আমি এখানে এসে পৌঁছোবার পরের দিনই নদী সাঁতারে মোল্লাখালিতে এসে উঠেছিল একটা বাঘিনী, গ্রামের লোকজন সেটাকে ঘিরে রেখিছেল, ভেবেছিলুম সেটাকে দেখতে যাবো, বিকেলেই খবর পেলুম ক্রুদ্ধ গ্রামবাসীরা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের নীতির তোয়াক্কা না করে সেটিকে মেরে ফেলেছে। সুন্দরবনে ভগবানের চেয়েও বাঘের কথাই বেশী স্থান পায় আলাপচারিতে।

এবারে নৌকোয় বেরিয়ে বুঝলুম, লঞ্চ-ভ্রমণের সঙ্গে এর কোনো তুলনাই হয় না। নৌকোয় বসে নদীকে অনেক কাছে পাওয়া যায়, দু'পাশের জঙ্গলকে আমরাই শুধু দেখি না, জঙ্গলও আমাদের দেখে।

বাঘ সম্পর্কে আমাদের এক ধরনের শহুরে কৌতূহল আছে। সেইজন্য আমি বারবার সবাইকে জিজ্ঞেস করছিলুম, আপনারা কেউ বাঘ দেখেন নি? নিজের চোখে?

আশ্চর্যের ব্যাপার, আমার নৌকোর সহযাত্রীরা সবাই নেতিবাচক ভাবে মাথা নাড়লো। এরা সবাই সুন্দরবনের নাড়ি নক্ষত্র জানে, এতদিন এখানে রয়েছে, অথচ কখনো বাঘ দেখেনি! আমি বাঘ সম্পর্কে রোমাঞ্চকর একাধিক গল্প শুনবো আশা করেছিলুম। বেশ নিরাশ নিরাশ লাগলো।

তখন আমি শুরু করলুম এক লোমহর্ষক কাহিনী।

কিশোর মাঝিটির প্রশ্ন শুনে আমি পাল্টা প্রশ্ন করলুম, ধরো যদি সার্কাসের বাঘই হয়। একটা সার্কাসের বাঘ যদি তোমার বুকে পা তুলে দাঁড়ায়, তুমি ভয় পাবে না?

ছেলেটি হে হে করে হাসতে লাগলো।

ইস্কুল মাস্টার এবার জিজ্ঞেস করলেন আপনি সত্যিই

সার্কাসের বাঘের খাঁচায় ঢুকে পড়েছিলেন নাকি ?

আমি বললুম, না। বাঘের থেকেও আমি শত হস্ত দূরেই থাকাই ভালো মনে করবো। পাকে চক্রে একবার আমি সত্যিই একটা মস্ত বড় কেঁদো বাঘের খপ্পরে পড়েছিলুম। ব্যাপারটা হয়েছিল উড়িষ্যায় যোশীপুরে—।

আমার কলকাতার বন্ধুটি যার নাম শিবাজী, সঙ্গে সঙ্গে বললো, ও, খৈরি ?

নৌকোর অন্যান্য সুন্দরবন বাসী সঙ্গীরা কেউ খৈরির নাম শোনেনি। এদিকের লোকের সঙ্গে খবরের কাগজের বিশেষ সম্পর্ক নেই। বড়-মাঝি জিজ্ঞেস করলো, খৈরি কি দাদা ?

রায় মঙ্গল নদী ছাড়িয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি সমুদ্রের দিকে। ডান দিকে দত্ত ফরেস্ট, সেখানে বাঘ নেই খুব সম্ভবত। বাঁ দিকের জঙ্গলটা বাঘের এলাকা বলে নির্দ্দিষ্ট, আমরা চলেছি সেই ধার ঘেঁষেই। একটা জায়গায় নদীর জল খানিকটা খাঁড়ির মতন ঢুকে গেছে জঙ্গলের মধ্যে, সেখানটার নাম কালীর চর সেখানে হাজার হাজার হাঁস এসে বসে। আমাদের গন্তব্য সেইদিকেই। সেখানে বাঘের উপদ্রবের ভয় আছে, আমরা কেউ শিকারী নই। সঙ্গে অস্ত্রও নেই, দূর থেকে পাখিগুলি

দেখে আসাই উদ্দেশ্য।

এই পরিবেশে আমি জমিয়ে বাঘের গল্প শুরু করলুম।

অভিজ্ঞতাটা আমার কাছে সুখকর ছিল না মোটেই, খানিকটা হাস্যকর হলেও হতে পারে।

সেবারে যাবার কথা ছিল সিমলিপাল জঙ্গলে। কলকাতা থেকে ট্রেনে ঝাড়গ্রাম, সেখান থেকে একটা গাড়ি নিয়ে বারিপদা, সেখান থেকে আবার একটা গাড়ি কোনো ক্রমে জোগাড় করে যোশীপুর। অবশ্য সিমলিপাল যাবার জন্য এত ঘুরপথে যাবার কোনো দরকার হয় না, কিন্তু আমাদের ভ্রমণটাই উল্টোপাল্টা। যোশীপুরে রাতটা কাটিয়ে পরদিন ভোরবেলা আমরা জিপ নিয়ে ঢুকবো জঙ্গলে, সেই অনুযায়ী যোশীপুরে বাংলো বুক করা ছিল। কিন্তু তখন খৈরির কথা মনেই পড়েনি।

যোশীপুর বাংলোর কম্পাউণ্ড মস্ত বড়, মনে হয় যেন বাংলোর পেছন থেকেই জঙ্গল শুরু হয়ে গেছে। ঘরগুলোর সামনে বেশ বড় একটি ঢাকা বারান্দা। লোহার গেট খুলে ভেতরে ঢোকার পরই দেখলুম, একটু দূরে গাছ পালার মধ্যে ঘুরছে একটা হলুদ-কালো ডোরাকাটা কী যেন! সত্যিই একটা বাঘ! আমরা এসে গেলে বারান্দাটায় বসতে না বসতেই বাঘটা চলে এলো সেখানে। ডি এফ এ শ্রীযুক্ত

চৌধুরীও সেখানে বসে বন কর্মচারীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন, সংক্ষেপে আমাদের জানালেন, ভয় পাবেন না। ও কিছু করে না!

বাঘটা আমাদের প্রত্যেকের কাছে এসে গন্ধ শুঁকতে লাগলো। আমাদের মধ্যে কারুকে তার পছন্দ হবে কি হবে না, কে জানে! আমি বড় সাইজের কুকুরও সহ্য করতে পারি না। কারুর বাড়িতে অ্যালসেশিয়ান কুকুর থাকলে সে বাড়িতে পারত পক্ষে যাই না। আমি লক্ষ্য করেছি, যাদের অ্যালসেশিয়ান থাকে, তারাও ঠিক ঐ ভাবেই বলে, "ভয় পাবেন না! ও কিছু করে না!" কিছু করে করে না মানে কি, কাছে এসে গন্ধ শুঁকবেই বা কেন?

একটু বাদে বাঘটা আবার বাগানে চলে গেল। আমরা চলে এলুম আমাদের নির্দ্দিষ্ট ঘরে। জামা কাপড় ছাড়বো কিনা ভাবছি, হঠাৎ শুনি জানালার কাছে মৃদু গর্জন। এবং বাঘের মুখ। বাঘটা জানলা দিয়ে আমাদের একটু ক্ষণ দেখলো, তারপরই ঢুকে এলো আমাদের ঘরে। তার আগেই আমরা দরজা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু একজন মহিলা (পরে জেনেছি, তাঁর নাম নীহার চৌধুরী) বলে উঠলেন, দরজা বন্ধ করবেন না! ও বন্ধ-দরজা দেখলে রেগে যায়!

একটা বাঘকে খুশী করার জন্য আমাদের দরজা খোলা রাখতে হবে। কিন্তু ঘরের মধ্যে বাঘ এসে ঘোরাঘুরি করবে, এটাই বা কেমন কথা! সারা ঘরে বাঘ-বাঘ গন্ধ! আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম তাড়াতাড়ি। আবার এসে বসলুম বারান্দায়। যোশীপুরের এই বাঘটি সাধারণ বনের বাঘের চেয়েও আয়তনে অনেক বড়। একে রোজ আট কেজি মাংস ও একটিন আমূল গুঁড়ো দুধ খাওয়ানো হয়। বনের বাঘ রোজ এত খাবার পাবে কোথায়? এর পেটে চর্বি থল্ থল্ করছে। বারান্দায় বসে শ্রীমতী চৌধুরী তাঁর পালিতা কন্যা এই খৈরি বিষয়ে নানান কাহিনী শোনাতে লাগলেন। আমরা গল্প শুনছি বটে, কিন্তু আমাদের সকলের চোখ লক্ষ্য রাখছে বাঘটা কত দূরে। আমাদের পাঁচজন বন্ধুর দলের মধ্যে রয়েছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সে ঐ খৈরি বিষয়ে ইতিমধ্যেই একটি ছোটদের বই লিখে ফেলেছে। সুতরাং তার ভয় পেলে চলে না। শ্রীমতী চৌধুরীর সঙ্গেও তার আগে থেকে চেনা, সুতরাং ঐ সব গল্প সেই উপভোগ করতে লাগলো বেশী।

এরপর শুরু হলো বাঘের ভোজন পর্ব। বাগানে এক জায়গায় ধপাস্ করে শুয়ে পড়লো খৈরি, আর মা যেমন নিজের শিশুর মুখে খাদ্য তুলে দেয়, সেই ভাবে শ্রীমতী চৌধুরী ওর মুখে মাংস পুরে দিতে

লাগলেন। কিন্তু বাঘ একজায়গায় বেশীক্ষণ বসে খায় না। এক এক গেরাস মুখে দিয়েই সে উঠে পড়ছে, চলে যাচ্ছে বাগানের দিকে, অনেক সাধ্য সাধনা করে ডেকে আনা হচ্ছে তাকে।

এক সময় বাঘটা হঠাৎ উঠে এলো বারান্দায়, এবং নিমাই নামে আমাদের এক বন্ধুর বাঁ হাতের কনুই শুদ্ধ অনেকখানি মুখে ভরে দিল। এবার একটু চাপ দিলেই নিমাইয়ের বাঁ হাতখানা চিরতরে বাঘের পেটে চলে যাবে। বাঘটাক হঠাৎ এরকম অদ্ভুত মতি গতির কারণ কী? ওর কি মোষের মাংস পছন্দ হয়নি বলে ও টাটকা মাংসের সন্ধানে এসেছে?

ডি এফ ও শ্রীযুক্ত চৌধুরী যথারীতি বললেন, ভয় পাবেন না, ও কামড়াবে না!

ভয় মানুষেব চুল খাড়া হয়ে যাবার কথা শুধু বইতেই পড়েছিলুম, এবার স্বচক্ষে দেখলুম। নিমাইয়েব মাথার সবকটা চুল সত্যিই খাড়া হয়ে গেছে, কাঁপা কাঁপা গলায় সে বললো, ওকে সরিয়ে নিন, নইলে আমরা অজ্ঞান হয়ে যাবো! ভয়ের চোটে নিমাই আমির বদলে আমরা বলে ফেলেছে। আমরা সশঙ্ক চিত্তে অথচ খানিকটা হাসতে হাসতেও, দেখতে লাগলুম ওকে। এই হাসির শাস্তি আমি পেলুম সঙ্গে সঙ্গেই!

বাঘটা নিমাইকে ছেড়ে এদিক ওদিক চেয়ে গজরাতে

লাগলো। বাঘের ডাকের সঙ্গে মানুষেব জন্ম জন্মান্তরের ভয়ের সম্পর্ক। পোষা বাঘ হোক আর যাই হোক, এরকম ডাক শুনলে বুক আপনিই কেঁপে ওঠে।

বাঘটা এবার চলে এলো সোজা আমার দিকে। তারপর সে আমার ডান দিকের বগলের মধ্যে ঢুঁ মারতে লাগলো। যেন সে আমার বগলেব মধ্যে অতবড় মাথাটা ঢুকিয়ে দিতে চায়। আমি অসহায়-ভাবে তাকালুম শ্রীমতী নীহার চৌধুরীর দিকে। তিনি স্নেহের হাসি দিয়ে বললেন, ও কিছু না। ও ঘামেব গন্ধ শুঁকতে ভালোবাসে। তখন ঘাম মানে কী। আমার সাবা শবীর দিয়ে কুলকুল করে ঘামেব নদী বইছে!

বাঘটা আর একবার ঢুঁ মারতেই আমি অটোমেটিক্যালি উঠে দাঁড়ালুম। সঙ্গে সঙ্গে বাঘটাও দাঁড়িয়ে ছুটো থাবা রাখলো আমাব বুকে। সেই কয়েকটি মুহূর্ত আমি জীবনে কখনো ভুলবো না। আমাব শবীরেব ওপরে একটা বিরাট কেঁদো বাঘ, আমার চোখের সামনে ওর জ্বলন্ত চোখ, সেই অবস্থায় বাঘটা ফ-র্-র্-র করে থুতু ছেটালো, সেই থুতুতে ভিজে গেল আমার মুখ ও জামা। ওবই মধ্যে আমি ভাবলুম, বাঘটা যদি আমায় না-ও কামড়ায়, আমি যদি বাঘটাকে শুদ্ধু মাটিতে পড়ে

যাই, তাহলে ওর অতবড় দেহের ভারেই আমি ছাতু হয়ে যাবো। শ্রীমতী চৌধুরী বারবার বলতে লাগলেন, ভয় পাবেন না, নড়বেন না, ওর গায়ে হাত ঝুলিয়ে দিল। কিন্তু হাত তোলার সাধ্য আমার নেই, আমার সারা শরীর অসাড়। আমার ও মাথার চুল খাড়া হয়ে গিয়েছিল কিনা তা তো আমি নিজের চোখে দেখিনি, তবে ঐ অবস্থায় আর একটুক্ষণ থাকলে আমি নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে যেতুম!

ইতিমধ্যে 'খৈরি, আমার খৈরি' গ্রন্থের প্রণেতা শক্তি আমার পাশ থেকে স্যুট্ করে উঠে গিয়ে সোজা চলে গেছে গেটের দিকে। নিমাই বাংলোর বাইরে দাঁড়িয়ে বললো, আমি সারারাত এই মাঠে শুয়ে থাকবো, তবু ওর মধ্যে আর যাবো না। আমাদের দল নেতা পার্থসারথি চৌধুরী বললো, নাঃ, ঐ বাঘের সঙ্গে রাত্রিবাস করা মোটেই কাজের কথা নয়। চলো, এক্ষুনি জঙ্গলে চলে যাই! তাই হলো, আমরা রওনা দিলুম সেই দণ্ডেই!

গল্প বলা শেষ করে আমি আমার বুকে হাত বুলিয়ে বললুম, এই যে ঠিক এই জায়গায় বাঘটা তার থাবা রেখেছিল।

শ্রোতারা সবাই চুপ। একটু পরে বড় মাঝিটি শুধু খানিকটা বিস্ময় খানিকটা বিরক্তি মিশিয়ে বললো, শখ করে কেউ বাঘ পোষে? থুঃ! ওটাকে

মেরে ফেলে না কেন ?

আমি বললুম, মারবে কী ? ঐ বাঘটা খুব বিখ্যাত, সারা পৃথিবীর অনেক পত্র পত্রিকায় ওর ছবি ছাপা হয়েছে।

বড় মাঝি আবার নদীর জলে থুতু ফেললো।

টাইগার প্রজেক্টের জন্য সুন্দরবনে বহু টাকা খরচ করে কত রকম বন্দোবস্ত হচ্ছে, কিন্তু সুন্দরবন এলাকার যতজনের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, তারা সকলেই বাঘকে শত্রু বলে মনে করে, এবং তাদের মতে বাঘ নামক প্রাণী জাতিটাকে বাঁচিয়ে রাখবার কোনো প্রয়োজন নেই।

আস্তে আস্তে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। কালীর চরের বেশ কাছাকাছি এসে পড়েছি আমরা। খাড়ির মধ্যে অনেক হাঁসের অস্তিত্ব টের পাচ্ছি বটে, কিন্তু আলো কমে আসায় আর ঠিক মতন দেখা যাচ্ছে না। আমি আর একটু ভেতরে যাবার কথা বললুম, কিন্তু মাঝি বা অন্য কেউ রাজি হলো না। একটু পরেই ভাঁটা শুরু হলে ফেরা মুস্কিল হবে। তা ছাড়া জায়গাটা ভালো নয়। এই বনে বাঘ আছে তো বটেই, কিন্তু তার চেয়েও বেশী ভয় ডাকাতের।

আমি বললুম, আমাদের কাছে তো টাকা পয়সা কিছু নেই, ডাকাত আমাদের কী করবে ?

মাস্টার মশাইটি বললেন, এখানকার ডাকাতদের

ব্যাপার আপনারা জানেন না। কিছু না পেলে ওরা জামা কাপড় খুলে নেয়। আপনি যে প্যান্ট-শার্ট পরে আছেন, তার দামও তো কিছু না হোক সত্তর আশী টাকা। আর এই নৌকোটা, এরও তো দাম আছে। জামা প্যান্ট খুলে নিয়ে ওরা লোককে এই জঙ্গলের পাশে নামিয়ে দিয়ে যায়।

আমি পাশের জঙ্গলের দিকে তাকালুম। দিনের বেলা দেখতে চমৎকার লাগছিল। এখন অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় সেই জঙ্গলের দিকে তাকাতেই গা ছম্ ছম্ করছে। নগ্ন অবস্থায় রাত্রিরবেলা এই জঙ্গলের পাশে পড়ে থাকা মোটেই উপাদেয় চিন্তা নয়।

সকলেরই মত হলো, তা হলে এবার ফেরা যাক। কিন্তু খুব নির্বিঘ্নে ফেরা গেল না। একটুক্ষণের মধ্যেই শুরু হলো ভাঁটার টান, এখন উল্টো দিকে যাওয়া যাবে না। আমাদের নৌকো একটা চরে আটকে গেল। জোয়ার আসবে ঘণ্টা দেড়েক বাদে।

আমাদের নৌকোটা অবশ্য জঙ্গলের খুব কাছে নয়। কোনো বাঘ হঠাৎ এক লাফে নৌকোর ওপর পড়তে পারবে না, সাঁতরে আসতে হবে। এই নদীর জলেও খুব কামঠের উপদ্রব, এবং কুমীর প্রকল্পের উদ্যোগে কিছুদিন আগেই এই নদীতে চল্লিশটি কুমীরের বাচ্চা

ছাড়া হয়েছে।

চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। জঙ্গলের দিকে তাকালেই মনে হয়, একটা বাঘ বুঝি আমাদের এক দৃষ্টে দেখছে। খুবই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। এ জঙ্গলে জোনাকিও জ্বলে না। কিন্তু বাঘের চেয়ে ডাকাতের কথাই আমার মনে পড়তে লাগলো বেশী।

বড় মাঝিকে আমি আবার জিজ্ঞেস করলুম, আপনি এতদিন সুন্দরবনের নদীতে নৌকো চালাচ্ছেন, সত্যিই কখনো বাঘ দেখেন নি?

বড় মাঝি বললেন, না!

তারপর যেন একটু ধমকের সুরেই আমায় আবার বললো, বাবু একটু চুপ করেন তো! অথবা এই সময়টা আপনি একটু ঘুমিয়ে লিন বরং।

আমি একটু ক্ষুণ্ণ হলুম। এই ভর সন্ধেতে হঠাৎ আমি ঘুমোতে যাবো কেন? তবে নৌকোর অন্য আরোহীদের মধ্যে যেন একটা ঝিমুনির ভাব এসে গেছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। অগত্যা আমিও চুপ করে গেলুম।

এক সময় নৌকোর তলায় জলের কলকল শব্দেই টের পাওয়া গেল জোয়ার এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই যেন এক সঙ্গে জেগে উঠলো। নৌকো চললো আবার। রাত সাড়ে দশটায় আমরা ফিরে

এলুম আমাদের গ্রামের কাছে।

জেটিতে নৌকো বেঁধে ওপরে উঠে আসার পর বড় মাঝি বললো, দাদা, আপনি বাঘের কথা জিজ্ঞেস কচ্ছিলেন না? এই ছাখেন। টর্চটা মেরে ছাখেন।

এই বলে সে জামাটা তুলে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াল। টর্চের আলোয় দেখলুম, তার পিঠে গভীর ক্ষত। খুব বেশী পুরোনোও মনে হলো না।

মাস্টার মশাই বললেন, ওর কী কড়া জান্, বাঘে কামড়ে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, তারপরও বেঁচে উঠেছে।

বড় মাছি দম্ভ করে বললো, আমারে খাবে, এমন বাপের ব্যাটা বাঘ আজও জন্মায় নি, বোঝলেন!

মাস্টারমশাই বললো, ও বাঘের গুনিন। সবাই ভাবে, সেই জন্যই বাঘে ধরার পরও বেঁচে উঠেছে।

ওদের মুখ থেকে আরও শুনলুম, এই মাঝি তার এই নৌকো নিয়ে প্রায়ই জঙ্গলে যায় বে-আইনী কাঠ কাটতে। সুন্দরবনের অনেকেরই জীবিকার সঙ্গে কাঠ জড়িত। একবার নয়, মোট পাঁচ বার, ঐ মাঝি দলবল নিয়ে বাঘের সামনে পড়েছে, তবু আবার যায়। ডাকাতের পাল্লায়ও পড়েছে অনেক বার।

অন্য বন্ধুটি বললো, দীনেশ নামে একটি ছেলে তার বাড়িতে কাজ করতো, মাত্র মাস খানেক আগে সে

এই রকম একটি কাঠ কাটার দলের সঙ্গে জঙ্গলে গিয়ে আর ফেরে নি।

এদের সকলেরই বাঘ বা ডাকাত সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু নৌকোর ওপর বসে আমি যখন এদের কাছ থেকে দু' একটা ঘটনা শুনতে চাইছিলুম, তখন সবাই চুপ করে ছিল কেন?

মাস্টারমশাই আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন, জঙ্গলেব কাছে বাঘের এলাকার মধ্যে গিয়ে বাঘের গল্প করা তো দূরের কথা, কেউ বাঘের নামও উচ্চারণ করে না। ঐ প্রসঙ্গ তুলে আমিই ভুল করেছিলুম।

সত্যিই আমার ভুল হয়েছিল।